অনীক

মার্চ ২০১৪
বর্ষ ৫০ □ সংখ্যা ৯
প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদক : দীপংকর চক্রবর্তী

সম্পাদকীয় □ ১

ঘটনাপ্রবাহ

দ্বিতীয় ক্রিমিয়ার যুদ্ধ □ সুচরিতা সেন □ ৩
আর্থিক সংস্কার... □ অপরাজিতা মুখার্জী □ ৫
ডেপুটেশনেও ভয়? কৃষ্ণা বন্দ্যোপাধ্যায় □ ৭
পস্কো আন্দোলন : কোন পথে? □ প্রদীপ রায় □ ৮
ডাঃ সমীর বিশ্বাসের বিরুদ্ধে... □ মিতা দত্ত □ ৯

প্রবন্ধ

ভারতীয় সংবাদপত্র... □ সুমন্ত্র বন্দ্যোপাধ্যায় □ ১০
ধর্ষকদের নয়... □ সঞ্জীব আচার্য □ ১১
সুন্দরবন থেকে বঙ্গোপসাগর □ আনু মুহাম্মদ □ ১৪
শিক্ষায় অরাজকতা □ সমরেশ মিত্র □ ১৬
মহাকাশ গবেষণা... □ শুভাশিস মুখোপাধ্যায় □ ২১

স্মরণ

মণিভূষণ ভট্টাচার্য স্মরণে □ সব্যসাচী দেব □ ২৯

গ্রন্থ আলোচনা/সমালোচনা

কলকাতার পুকুর □ অরিজিৎ □ ৩৩
মুর্শিদাবাদ: দুয়ার হতে দূরে □ দেবরাজ চক্রবর্তী □ ৩৭

লেখা, চিঠিপত্র ও টাকা-পয়সা পাঠাবার ঠিকানা :
প্রযত্নে : পিপলস বুক সোসাইটি
১০/২বি, রমানাথ মজুমদার স্ট্রিট। কলকাতা ৭০০০০৯
দূরভাষ : ৯৪৩৩৭২৪৪৬২/৮৯০২১০৪৯৮৭
বার্ষিক গ্রাহক চাঁদা : ১৫০ টাকা
ই-মেল : aneek.bm@gmail.com
ব্লগ : aneekpotrika.wordpress.com
কার্যালয় :
১০/২বি, রমানাথ মজুমদার স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০০০৯
(মঙ্গল ও শুক্র : সন্ধ্যা ৬টা থেকে ৮টা)
সম্পাদকমণ্ডলী : **রতন খাসনবিশ**
সুমিতা সিদ্ধার্থ শুভাশিস প্রণব

সম্পাদকীয়

নিষ্ফলা নির্বাচন

দুন্দুভি বেজে ওঠে ডিম ডিম রবে, এপ্রিল মাসে দেশে ভোটযুদ্ধ হবে (কবিগুরু মার্জনা করবেন)। মধ্যযুগীয় নৃপতিদের মতো দিল্লীর তখত্-ই-তাউস দখলের লড়াইয়ে আধুনিক ভারতের রাজনীতির প্রধান পুরুষেরা এখন ভোটযুদ্ধের সৈন্য সমাবেশে ব্যস্ত। জোট ভাঙছে, জোট গড়ছে, কেউ কেউ আবার একাই সব ভাগটা কুক্ষিগত করতে 'একলা চলো' নীতি নিয়েছে। ১১-দলের তৃতীয় ফ্রন্ট জোট ইতিমধ্যেই ১০-এর দশাপ্রাপ্ত হয়েছে। ফোনে ফোনে, কানে কানে চলছে কালনেমির লঙ্কাভাগ।

একটা লোকসভার দাম কত? বাজার অর্থনীতিতে যখন সবকিছু নিয়ন্ত্রিত হয়, তখন লোকসভাই বা বাজারের বাইরে থাকবে কেন? যদি ধরে নেওয়া যায়, যত টাকা ব্যয় হয় একটা লোকসভা তৈরির জন্য সাধারণ নির্বাচনে, সেটাই লোকসভার দাম— তাহলে আগামী লোকসভার দাম পড়বে বেসরকারি মতে ১৮ হাজার কোটি টাকা। অঙ্কটা চমকে দেয়, কিন্তু উড়িয়ে দেওয়া যায়না। ইতিমধ্যেই টিভি-সংবাদপত্রে দলীয় এবং সরকারি বিজ্ঞাপনে দৈনিক লক্ষাধিক টাকা ব্যয় আমাদের নজরে এসেছে। প্রচারাভিযানে আকাশপথে বিচরণ নিশ্চয় নিখরচায় হচ্ছেনা। দল ভাঙাতে, মান ভাঙাতে কত কোটি টাকা দাম লাগে, তারও কিছু কিছু নমুনা সাধারণ মানুষের কর্ণগোচর হয়েছে। আর প্রার্থীরা তো কেউ কৌপীন পরে ভোট যাচ্ঞা করবেন না। সেখানেও কোটি কোটি টাকা উড়বে। সুতরাং দল-প্রার্থী-সরকার, সব মিলিয়ে আসন্ন ভোটযুদ্ধের ব্যয় প্রকৃত অর্থেই আমজনতার কল্পনাসীমার বাইরে।

যাদের হাতে দেশ শাসন এবং গণতন্ত্রের ভার আমরা সমর্পণ করি, তাদের আর্থিক অবস্থাটা একবার ঝালিয়ে নেওয়া দরকার। সুইস ব্যাঙ্কে বা লুকোনো টাকা কার কোথায় কী আছে জানি না। ঘোষিত সম্পত্তির পরিমাণ বিচারে কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভা সদস্যদের ৭৫ শতাংশই ক্রোড়পতি এবং বিগত পাঁচ বছরে তারা তাদের সম্পত্তি বৃদ্ধি করেছে গড়ে ৩.৩ কোটি টাকা। এক মন্ত্রী সম্পত্তি বাড়িয়েছেন ১০৯২ শতাংশ (৬৪ কোটি টাকা), অপর দুই মন্ত্রীর সম্পত্তি বৃদ্ধির হার ৮২৮ এবং ৭০৫ শতাংশ। ১৫ জন মন্ত্রীর নাকি সম্পত্তি কমেছে। কথাটা শুনে অবশ্য 'ঘোড়াও হাসবে'। ২০০৪ সালে নির্বাচিত সাংসদদের মধ্যে, ৩০৪ জন ২০০৯ সালে পুনর্নির্বাচনের জন্য প্রার্থী হয়েছিলেন। উক্ত পাঁচ বছরে সাংসদ অবস্থায় তাঁদের গড় সম্পদ বৃদ্ধি ছিল ২৮৯ শতাংশ। কংগ্রেসি এমপি-দের সম্পদ বৃদ্ধি ছিল ২৪ শতাংশ (৩৫ কোটি থেকে ৮৬ কোটি), বিজেপি সাংসদদের ৩১৪ শতাংশ (১১ কোটি থেকে ৩৬ কোটি)।

এই সাংসদরা কাদের প্রতিনিধি? একটা দেশ আছে, যে দেশে ৫০-এরও কম অর্বুদপতি (billionaire) পরিবার দেশটির ১০ শতাংশের বেশি সম্পদ ভোগ করে এবং ১২০ কোটির দেশে মাত্র ৭৮৫০টি পরিবার দেশটির প্রায় অর্ধেক সম্পদের মালিক। আর একটি দেশ আছে, যে দেশে ৭০ শতাংশ মানুষ ক্ষুন্নিবৃত্তির জন্য দৈনিক জীবনসংগ্রামে লিপ্ত। ঘটনাচক্রে দুটো দেশেরই নাম ভারতবর্ষ। অর্বুদপতিদের সম্পত্তি-বৃদ্ধির সিংহভাগ অর্জিত হয়েছে সরকারি সহায়তায়, দেশের প্রাকৃতিক সম্পদগুলি দখল করার অনুমস

সুযোগপ্রাপ্তির মাধ্যমে। যার সাম্প্রতিক উদাহরণ, রিলায়েন্স কোম্পানিকে প্রাকৃতিক গ্যাসের দাম বৃদ্ধি করার অনুমতি প্রদান। আর এই দখলদারি প্রদানের অনুষঙ্গ হিসাবে আসে বিস্থাপন— জীবিকা ও বাসস্থান থেকে প্রান্তিক ও জনজাতি অধিবাসীদের অবশ্যম্ভাবী বিচ্ছিন্নতা।

বিপরীতে, কর্পোরেট কোম্পানিগুলির অনুদানে রাজনৈতিক দলগুলি পুষ্ট হচ্ছে। ঘোষিত হিসাব অনুযায়ী, বিগত সাত বছরে (২০০৪-১১) ভারতের প্রধান রাজনৈতিক দলগুলি প্রায় ৪৩৬ কোটি টাকার অনুদান পেয়েছিল, যার মধ্যে কর্পোরেট কোম্পানিগুলি প্রদত্ত অনুদানের পরিমাণই ৩৭৯ কোটি টাকা (৮৭ শতাংশ)। ঘোষিত মোট কর্পোরেট অনুদানে দুই বৃহৎ দলের হিস্যা ৯৬ শতাংশ— বিজেপি-র ৫১, কংগ্রেসের ৪৫। সিপিএম-এর বিবৃতি অনুযায়ী তারা ১.৭৮ কোটি টাকা কর্পোরেট অনুদান পেয়েছিল।

সুতরাং এটা বলা যেতেই পারে, দেশে এখন প্রকৃত অর্থে কর্পোরেট শাসন চলছে। ভারতের যে বৃহৎ দুর্নীতির কাহিনীগুলি এখন প্রকাশ্যে এসেছে, তার মূলেও আছে কোনো না কোনো বৃহৎ কোম্পানির স্বার্থ। সেই স্বার্থে কংগ্রেস-বিজেপি-বিজেডি-সিপিএম-তৃণমূল সকলেই বাঁধা পড়েছে। পশ্চিমবঙ্গে বামফ্রন্ট সরকার একচেটিয়া পুঁজি-পন্থী যে নীতি গ্রহণ করেছিল, সিপিএম-এর তরফে এখনও পর্যন্ত সে বিষয়ে কোনো সমালোচনা লক্ষ্য করা যায়নি বা সেই নীতি থেকে সরে আসার কোনো লক্ষণও দেখা যাচ্ছে না। দিল্লীর নবোত্থিত 'আপ' দল-এর রাজনীতিতে প্রশাসনিক দুর্নীতির বিরুদ্ধাচরণ থাকলেও, কর্পোরেট শাসিত নব বিশ্বায়নের প্রশ্নে তাদের 'ভিশন' অপরিষ্কার। উন্নয়ন কথাটার এখন একটাই অর্থ দাঁড়িয়েছে, বিনামূল্যে বা অকিঞ্চিৎকর অর্থের বিনিময়ে বৃহৎ কর্পোরেট সংস্থাগুলিকে জমি প্রদান, ট্যাক্স মকুব এবং তাদের মুনাফা বৃদ্ধির নিমিত্তে যাবতীয় সরকারি আনুকুল্য। আম্বানি-আদানী-টাটাকে গুজরাটের জল-জমি-সম্পদ বিতরণের মাধ্যমেই নরেন্দ্র মোদী কর্পোরেট গোষ্ঠীর নয়নের মণিতে পরিণত হয়েছে।

তাহলে আমজনতা কী পাবে? আসন্ন সাধারণ নির্বাচন তাদের কোন স্বার্থটা রক্ষা করবে? স্থায়ী ও প্রকৃত কর্মসংস্থান, মুল্যবৃদ্ধি ইত্যাদি দৈনন্দিন সমস্যাগুলি সমাধানের কোনো ইঙ্গিত নেই। রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস ও দমন-পীড়নের প্রতিকারের আশ্বাস নেই। শ্রমজীবী মানুষের মৌলিক অধিকারগুলি সুরক্ষার প্রচেষ্টা নেই। মানুষের সামগ্রিক স্বার্থ উপেক্ষা করে ক্ষুদ্র গোষ্ঠীস্বার্থে উস্কানি দিয়ে, সাধারণ মানুষের মধ্যে বিভাজন সৃষ্টি করে শাসক শ্রেণী বাঁচার পথ খুঁজছে। এই নির্বাচনে আমজনতার প্রাপ্তি কিছু নেই। সেটা বোঝার ও বুঝিয়ে দেওয়ার সময় এসেছে।

দীপংকর চক্রবর্তী-কে স্মরণ

২৭ জানুয়ারি ২০১৪— অনীকের প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক দীপংকর চক্রবর্তীর প্রয়াণের এক বছর পূর্ণ হলো। অনীক এবং তাঁর পরিবার ঐ দিন 'র‍্যাডিকাল হিউম্যানিস্ট সমিতির' সভাকক্ষে এক ঘরোয়া সভায় দীপংকর চক্রবর্তীকে স্মরণ করে। এসেছিলেন দীপুদার কাছের কিছু মানুষ, অনীক-এর সুহৃদবন্ধুরা। সঞ্চিতা রায়চৌধুরির সঙ্গীত দিয়ে সভা শুরু হয়। দীপংকর চক্রবর্তীর ব্যক্তিত্ব ও রাজনৈতিক সত্তা প্রসঙ্গে অলোচনা করেন সর্বশ্রী দীপাঞ্জন রায়চৌধুরি, প্রশান্ত রায়, রতন খাসনবীশ, সলিল বিশ্বাস, অশোক চট্টোপাধ্যায়, ধীরাজ বসু, নীতিশ রায়, আশীষ লাহিড়ি, সুমিতা দাস প্রমুখ। গান গেয়েছিলেন শাশ্বতী চক্রবর্তী। আবৃত্তি পরিবেশন করেন তনুশ্রী সেনগুপ্ত। সবশেষে প্রদর্শিত হয় ''বন্দীমুক্তি ২০১১'' তথ্যচিত্রটি। অনুষ্ঠানটির সঞ্চালনার দায়িত্বে ছিলেন শুভাশীষ মুখার্জি। বহরমপুরে দীপংকর চক্রবর্তীকে স্মরণ করা হয় ভিন্নপথে। এপিডিআর-এর বহরমপুর শাখার উদ্যোগে ১১ ফেব্রুয়ারি বহরমপুর ক্লাবের সামনে 'সমস্ত রাজনৈতিক বন্দীদের নিঃশর্ত মুক্তি', 'ইউএপিএ সহ সমস্ত কালাকানুন প্রত্যাহার', 'নারী নির্যাতন রোধে রাজ্য সরকারের যথাযথ পদক্ষেপ', 'রাষ্ট্রিয় সন্ত্রাস বন্ধ করা' ইত্যাদি দাবিতে দুপুর ১২টা থেকে বিকাল ৫টা পর্যন্ত অবস্থান কর্মসূচী পালন করা হয়। এপিডিআর-এর কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব এই কর্মসূচীতে অংশগ্রহণ করেন। মানবাধিকার আন্দোলনে দীপংকর চক্রবর্তীর ভূমিকা স্মরণ করে বক্তারা দাবিগুলির সমর্থনে বিস্তারিত আলোচনা করেন।

ঘটনাপ্রবাহ

দ্বিতীয় ক্রিমিয়ার যুদ্ধ : রাশিয়া বনাম ইউক্রেন

ক্রিমিয়া রাশিয়ার দক্ষিণে একটি পেনিনসুলা বা উপদ্বীপ। ঊনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি যেখানে যুদ্ধ হয়েছিল। একদিকে জারিস্ট রাশিয়া, অন্য পক্ষে ব্রিটেন, ফ্রান্স, তুর্কি। টলস্টয় এই যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন। তা নিয়ে লিখেছিলেন বিখ্যাত উপন্যাস সেবাস্তপোল।

সোভিয়েত ইউনিয়ন ভেঙে টুকরো টুকরো হওয়ার সময় অঙ্গ রাজ্য ইউক্রেন রূপান্তরিত হলো স্বতন্ত্র রাষ্ট্রে। যদিও সাংস্কৃতিক ও ভাষাগত দিক থেকে রাশিয়া ও ইউক্রেনের সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ। অর্থনৈতিকভাবেও যুক্ত। ১৯৫৪ সালে ক্রুশ্চভের আমলে ক্রিমিয়াকে ইউক্রেনের সাথে জুড়ে দেওয়া হয়েছিল রাশিয়া থেকে বিচ্ছিন্ন করে। তখন এই পরিবর্তনকে খুব গুরুত্বপূর্ণ মনে হয়নি। সোভিয়েত ইউনিয়ন ভেঙে যাবে এমনটা তখন ছিল অকল্পনীয়। কিন্তু ভাঙনের পর সমস্যা দেখা দিল। কৃষ্ণসাগরের উপর বড়ো নৌঘাঁটি রুশ, যদিও তার ভৌগোলিক সীমানা ইউক্রেনে। ১৯৯৪ সালের চুক্তি অনুযায়ী রাশিয়া ঘাঁটি ও তার সংযুক্ত অস্ত্রশস্ত্র নিজের ভাগে রাখে। বিনিময়ে ইউক্রেন পায় আর্থিক সুবিধা।

সমস্যা এখানেই মিটল না। অন্যান্য প্রাক্তন সোভিয়েত রাষ্ট্রের মতো এখানেও শুরু হলো অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অশান্তি। রাশিয়ার মতো ইউক্রেনেও একদল 'অলিগার্ক'-জাতীয় সম্পত্তি গ্রাস করে কোটিপতি হয়ে বসল। রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা তাদের হাতেই কেন্দ্রীভূত হলো। সাধারণ মানুষের অবস্থা খুব একটা ঈর্ষণীয় হলো না। এ ছাড়া ইউক্রেনে গোড়া থেকেই এক ধরনের আঞ্চলিক বিভাজন গড়ে উঠেছিল। পশ্চিম ইউক্রেন ইউরোপের বেশি কাছে। পূর্ব ইইরোপ সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক দিক থেকে রাশিয়ার সঙ্গে বেশি ঘনিষ্ঠ। ক্রিমিয়ার ৬০ শতাংশ ও পূর্ব ইউক্রেনের সব মিলিয়ে ৪০ শতাংশ মতো মানুষ রুশভাষী। সাম্প্রতিক সমীক্ষা অনুসারে ক্রিমিয়া ও পূর্ব ইউক্রেনের বাসিন্দাদের বড় অংশ ইউক্রেন নয়, রাশিয়ার প্রতি বন্ধুভাবাপন্ন। পশ্চিম ইউক্রেন মূলত ক্যাথলিক, পূর্ব ইউক্রেন রাশিয়ার মতোই অর্থোডক্স। নিরীশ্বরবাদী কমিউনিস্ট আমলে ধর্মের তেমন গুরুত্ব ছিল না। কিন্তু এখন নানা ধর্মীয় বিভাজন স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। তার উপর পূর্ব ইউক্রেনের ভারী শিল্প প্রধান অর্থনীতি আমদানি রপ্তানির জন্য।

এক দশক আগে ২০০৪ সালে আজকের ঘটনার পূর্বাভাস দেখা দিয়েছিল। বৈধ নির্বাচনে রুশপন্থী ইয়ানুকোভিচ জয়লাভ করতে চলেছিলেন। 'কমলা বিপ্লবে' লক্ষ লোক পথে নামিয়ে ব্যাপারটা বানচাল করা হলো। তার পিছনে ছিল পশ্চিম ইউরোপ ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মদত। USAID, National Endowment for Democracy (NED), International Republican Institute ইত্যাদি সংস্থা। পরে পশ্চিম পন্থী জোট ভেঙে গেল। ২০১০ সালে ইয়ানুকোভিট প্রেসিডেন্ট হলেন। তিনি রাশিয়া ও পশ্চিমের মধ্যে ভারসাম্য বজায় রেখেই চলছিলেন। কিন্তু ২০১৩-র শেষে শ্যাম আর কূলের মধ্যে বেছে নেওয়া অনিবার্য হয়ে উঠল। স্থির হলো ইয়ানুকোভিচ ইউরোপীয় ইউনিয়নের সঙ্গে চুক্তি সই করবেন। ব্যাপারটা রাশিয়ার আদৌ পছন্দ ছিল না। রুশ রাষ্ট্রপ্রধান পুতিন চাইছিলেন ইউরেশিয়ান ইউনিয়ন গড়ে তুলতে, যার মধ্যে প্রাক্তন সোভিয়েত ইউনিয়নের অনেকটাই স্থান পাবে। আর্থিক দিক দিয়ে সংকটে পড়া ইউক্রেনকে পুতিন লোভ দেখালেন। ১৪ বিলিয়ন ডলার, বাজার দরের চেয়ে সস্তায় গ্যাস সরবরাহ ইত্যাদি। অনেকটা রুশ চাপে ইয়ানুকোভিচ শেষ মুহূর্তে Free and Comprehensive Free Trade Agreement থেকে পিছিয়ে এলেন। এ জন্য পশ্চিমের মিডিয়া ও সরকারগুলি তাঁকে খলনায়ক রূপে অভিহিত করেছে। কিন্তু পিছিয়ে আসার যথেষ্ট কারণ ছিল। ইউরোপীয় ইউনিয়নের কোটা অনুযায়ী চিনি ও গমের মতো কৃষিপণ্য রপ্তানি সীমিত করতে হবে। ২০ হাজার টন থেকে বাড়িয়ে বড় জোর ২০ লক্ষ টন করা যেতে পারে। অথচ ইউক্রেন ১-১.৫ কোটি টন কৃষিপণ্য রপ্তানি করে। ইউরোপীয় ইউনিয়নের কড়া নিয়ন্ত্রণ অনুসারে ইউক্রেনের বহু ব্যবসা ও কলকারখানা বন্ধ হয়ে যাবে। ইয়ানুকোভিচের বক্তব্য, চুক্তির দরুন ইউক্রেনের অর্থনীতির ২০০০ কোটি ইউরো ক্ষতিগ্রস্ত হতো। এই হিসেব খুব একটা ভুল, তাও বলা যায় না। তার ওপর পশ্চিমের দিকে ঝুঁকলে রাশিয়া নয়, ধার নিতে হবে আইএমএফ থেকে। এই সংস্থার নিয়ম অনুসারে গ্যাসের অনুদান ৪০ শতাংশ কমাতে হতো। লোকের অসুবিধা বই সুবিধা হতো না। গ্যাস আসেও রাশিয়া থেকে। রাশিয়া ইউক্রেনের বৃহত্তম বাণিজ্য সঙ্গী। কিন্তু পশ্চিম ইউরোপের মানুষের একাংশ এ সব যুক্তি শুনতে রাজি নয়। তাদের দাবি, যে কোনো মূল্যে ইউরোপীয় ইউনিয়নের সঙ্গে গাঁটছড়া বাঁধতেই হবে। প্রায় তিন মাস ধরে, নভেম্বর থেকে ফেব্রুয়ারি, রাজধানী কিয়েভ ও পশ্চিম ইউরোপের অন্যান্য বড় শহরে লাগাতার আন্দোলন ও বিক্ষোভ প্রদর্শন চললো। নানা সরকারি অফিস দখল করা হলো। ইউরোপীয় ইউনিয়নের সঙ্গে চুক্তি ছাড়িয়ে বিক্ষোভকারীদের দাবি হলো জমানা পাল্টানো। শেষে ইয়ানুকোভিচ দেশ থেকে পালাতে বাধ্য হলেন। যত দূর জানা যায়, তিনি এখন দক্ষিণ রাশিয়ায়। কিয়েভে একটি অস্থায়ী সরকার প্রতিষ্ঠিত হলো। স্থির হলো, মে মাসের মাঝামাঝি নির্বাচন হবে।

এ নিয়ে রাশিয়া তার গালে এত বড় এক চড় নীরবে মেনে নিতে রাজি নয়। কৃষ্ণসাগরে নৌবাহিনী সক্রিয় হয়ে উঠলো। ক্রিমিয়াতে এক হাজার বিশেষ রুশ সৈন্য। রাশিয়া ঘোষণা

করল, ১৬ মে রবিবার ক্রিমিয়াতে গণভোট বা রেফারেন্ডাম হবে। এর মাধ্যমেই ঠিক হবে, ক্রিমিয়া ইউক্রেনের মধ্যে থাকবে, না রাশিয়ার অংশ হবে। বলা বাহুল্য, ইউক্রেন এই গণভোটের বৈধতা মেনে নেয় নি। ইউক্রেনের এক ইঞ্চি জমি ছাড়বে না, এমন পণ করেছে। পশ্চিম ইউরোপ, উত্তর আমেরিকা, ন্যাটো ইউক্রেনকে জোরালোভাবে সমর্থন করল। রাশিয়ার বিরুদ্ধে কড়া নিষেধাজ্ঞা (স্যাংশন) জারি করার ভয় দেখাল। এর মধ্যেই কোনো কোনো নিষেধাজ্ঞা বলবৎ হয়ে গেছে। পূর্ব ইউক্রেনে কোথাও কোথাও রুশ ও ইউক্রেনিয়ান সেনাদের মধ্যে বিচ্ছিন্ন সংঘর্ষ শুরু হয়েছে। আর কিছুটা ২০০৮ সালের মতো যখন জর্জিয়ার দুই অঞ্চল অরকাজিয়া ও দক্ষিণ ওসেহির রাশিয়ার ছত্রছায়ায় বিচ্ছিন্ন হয়েচিল জর্জিয়া থেকে।

এই লেখা যখন প্রেসে যাচ্ছে, তখন অবস্থা এই রকম। ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত। তবে কয়েকটি মন্তব্য করা যেতে পারে।

ইউক্রেনের বিক্ষোভ যতখানি না স্বতঃস্ফূর্ত ছিল তার চেয়ে বেশি ছিল পশ্চিমের মদতপুষ্ট। পশ্চিমা সরকারগুলি আর মিডিয়া ক্রমাগত বিক্ষোভকারীদের সমর্থন ও সহায়তা করে এসেছে। রাশিয়া ঠিকই বলেছে, এটা বিদেশের ব্যাপারে হস্তক্ষেপ ভিন্ন আর কিছু নয়। ইউক্রেনে মার্কিন রাষ্ট্রদূত জেফেরে পায়াট ও মার্কিন সহকারী রাষ্ট্রসচিব ভিক্টোরিয়া নুলান্ড বিরোধীদের সঙ্গে লাগাতর যোগাযোগ রেখেছিলেন। কিয়েভের বিক্ষোভকেন্দ্র ময়দানে এসে বিক্ষোভকারীদের স্যান্ডউইচ ও চকোলেট খাইয়েছিলেন। এসেছিলেন ইউরোপীয় ইউনিয়নের প্রতিনিধি ক্যাথারিন অ্যাশটন। কিয়েভের মসনদে কাকে বসানো হবে, তা নিয়ে ওয়াশিংটন ও ইউরোপীয় ইউনিয়নের মধ্যে মৃদু বিতর্কও হয়েছিল।

বিক্ষোভকারীরা যে সর্বত্র খুব শান্তিপূর্ণ ব্যবহার করেছে তাও নয়। মলোটভ ককটেল ইত্যাদির ব্যবহার চোখে পড়েছে। লেনিনের মূর্তি ভাঙা হয়েছে। এটা অবশ্য গত সিকি শতাব্দী ধরে পূর্ব ইউরোপ ও প্রাক্তন সোভিয়েত ইউনিয়নে জলভাত। প্রতিবাদীরা অজস্র দলে বিভক্ত। তাদের মধ্যে অগ্রগণ্য দুটি ফ্যাসিবাদী, চরম দক্ষিণপন্থী দল। সোবোদা ও দক্ষিণী সেক্টর। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কালে ইউক্রেন যখন জার্মান নাৎসিদের দখলে ছিল, তখন স্তেপান বান্দেরার নেতৃত্বে এক দল নয়া-নাৎসি দখলদারদের সঙ্গে সহযোগিতা করত ও গণহত্যা চালাত। আজকের ফ্যাসিবাদী দলগুলি তাদেরই আত্মিক বংশধর। এমনকি ইহুদি বিদ্বেষও তারা উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছে। পুতিনকে এরা নাম দিয়েছে 'মস্কোর ইহুদি প্রেমিক' বা এই জাতীয় কিছু। পশ্চিমের চোখে এরাই হিরো। অস্থায়ী মন্ত্রীসভায় চরম দক্ষিণপন্থী দলদুটি সাতটি আসন পেয়েছে। তার মধ্যে আছে ডেপুটি প্রধানমন্ত্রীর পদ ও স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক। এরা দেশে কোন্ গণতন্ত্রের স্বর্গ প্রতিষ্ঠা করবে!

বিরোধীরা কথা দিয়ে কথা রাখে নি। স্থির হয়েছিল, বিরোধীরা দখল করা সরকারি অফিস ছেড়ে দেবে। বিনিময়ে যে সব বিরোধীকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল, তাদের মুক্তি দেওয়া হবে। সরকার কথা রাখলেও বিরোধীরা রাখে নি। তার পর ২১ ফেব্রুয়ারি সই হলো বিখ্যাত আপস চুক্তি। আপস না বলে একে বলা উচিত সরকারপক্ষের একতরফা আত্মসমর্পণ। ইয়ানুকোভিচ বিরোধীদের দাবি প্রায় ১০০ শতাংশ মেনে নিলেন। জোট সরকার গড়া হবে, সব দল নিয়ে। ইয়ানুকোভিচ প্রেসিডেন্ট হবে যে বাড়তি ক্ষমতা হাতে তুলে নিয়েছিলেন, তা ছেড়ে দিলেন। নির্বাচনের তারিখ এগিয়ে আনা হলো। ফ্রান্স ও জার্মানির চাপেই এটা সম্ভব হয়েছিল। আশা করা যেত, অন্তত পরবর্তী নির্বাচন পর্যন্ত শান্তি থাকবে। তা হলো না। পর দিনই গাড়িতে বোমা মেরে ইয়ানুকোভিচকে দেশছাড়া করা হলো। ফিরে আসার পথও বন্ধ করা হলো। ঘোষিত হলো, হাতে পেলেই তাকে গ্রেপ্তার করা হবে। এমনকি, পাঠানো হবে হাগ শহরে আন্তর্জাতিক বিচারালয়ে, বিচারের জন্য। তাঁর বিরুদ্ধে দু-দফা অভিযোগ। তিনি না কি দুর্নীতির পথে প্রচুর অর্থোপার্জন করেছেন। আর প্রতিবাদের সময় প্রায় ৮০ জন বিক্ষোভকারীদের গুলি করে মেরেছেন। অন্য দিকে 'কমলা' বিপ্লবের নেত্রী, 'গ্যাস-রাজকন্যা' ইউলিয়া তিমোশেঙ্কোকে দুর্নীতির দায়ে জেলখাটা থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে। দুর্নীতির বিষয়টি অসম্ভব নয়। আবার এখনও পর্যন্ত সে সাক্ষ্যপ্রমাণ আছে, তার ভিত্তিতে নিশ্চিত হওয়া যায় না। মনে রাখতে হবে, পূর্ব জার্মানির হোনেকার ও রুমানিয়ার চাওসেস্কুর বিরুদ্ধে অনুরূপ অভিযোগ আনা হয়েছিল। চাওসেস্কুকে তো সস্ত্রীক নৃশংসভাবে হত্যা করা হয়েছিল, বিচারের প্রহসনের পর। পরে দেখা গেল, অভিযোগ ছিল মিথ্যা। ইউগোস্লাভিয়ার রাষ্ট্রনায়ক মিলোসেভিককে পদচ্যুত ও বন্দী করে আন্তর্জাতিক আদালতের কাঠগড়ায় দাঁড় করানো হয়েছিল। সেখানেই দু বছর পর তাঁর মৃত্যু হয়। ইতিমধ্যে তাঁর বিরুদ্ধে প্রধান অভিযোগ, সংখ্যালঘু আলবেনিয়ানদের গণহত্যা, প্রমাণ করা যায় নি। এ জাতীয় প্রচার পুরোপুরি বিশ্বাসযোগ্য নয়। আমরা দেখেছি, কিয়েভে বিক্ষোভ অহিংস ছিল না। হতে পারে, নিরাপত্তা বাহিনী বাড়াবাড়ি করেছিল। তবে অনেক সময় তাদের গুলি চালাতে হয়েছিল নিছক আত্মরক্ষার জন্য।

যাই হোক, ২১ ফেব্রুয়ারির চুক্তি ভঙ্গ রাশিয়ার অভ্যন্তরে বিরাট প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করল, এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। পুতিন কি গোড়া থেকেই ক্রিমিয়া দখলের পরিকল্পনা করেছিলেন! এ বিষয়ে পর্যবেক্ষকদের মধ্যে মতভেদ আছে। কিয়েভের তিন মাস ব্যাপী আলোড়নের অনেকটা সময় জুড়ে পুতিন মোটামুটি চুপচাপ ছিলেন। ব্যাপারটা ইউক্রেনের নিজস্ব সমস্যা, তাদেরই মিটিয়ে নেওয়া উচিত, এই জাতীয় কথা বলেছিলেন। তাছাড়া সেসময় রাশিয়ার মাটিতে শীতকালীন অলিম্পিক নিয়ে পুতিন খুব ব্যস্ত ছিলেন। ব্যাপারটাকে তিনি নিজের ও রাশিয়ার মানসম্মানের প্রশ্ন হিসেবে নিয়েছিলেন। তার মধ্যে পশ্চিমকে

চটানো সঙ্গত মনে করেন নি। তাছাড়া তিনি বোধ হয় ভেবেছিলেন, শান্তিপূর্ণ ও কূটনৈতিক সমাধান সম্ভব। চুক্তি ভঙ্গ ও ইয়ানুকোভিচকে দেশ ছাড়া করার মধ্যে পুতিন দেখেছেন বিশ্বাসঘাতকতা। ইউক্রেনের বর্তমান সরকারকে রাশিয়া স্বীকৃতি দেয় নি। অন্যায়ভাবে সেখানে রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করা হয়েছে, যাকে বলে ক্যু দে তা।

ক্রিমিয়ার প্রশ্নে, আইন বা নীতির দিক থেকে দেখলে বিষয়টি জটিল। একটি রাষ্ট্রের অংশবিশেষের কি বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ার অধিকার আছে? এ নিয়ে কম বিতর্ক হয় নি। পশ্চিমের দৃষ্টিভঙ্গি সুবিধাবাদী। নিজের যখন যা সুবিধা হয় সেই নীতি অনুসরণ করে। যখন সোভিয়েত ইউনিয়ন ভেঙে টুকরো টুকরো হলো, তখন পশ্চিমের আনন্দের সীমা ছিল না। তাহলে প্রাক্তন সোভিয়েত রাষ্ট্রগুলি, যাদের জন্মই ভাঙনের মধ্যে, তাদের মধ্যে আরও ভাঙন করা যাবে না কেন? রাষ্ট্রনায়কেরা অবশ্য তা মানতে চান না। ১৯৯১ সালে বিংশ শতাব্দীর একেবারে শেষে, পশ্চিমা সামরিক জোট নাটো তখন ইউগোস্লাভিয়ার যেটুকু ছিল, তার ওপর আক্রমণ করছে। অজুহাত, আগেই বলা হয়েছে, মিলোসেভিচ না কি আলবানিয়ান কসভোবাসীদের উপর অত্যাচার করছেন। কসভো এলো নাটোর ছত্রছায়ায়। এর পর ইউগোস্লাভিয়ার আরো ক্ষুদ্র ভগ্নাংশ সার্বিয়া থেকে কসভো আনুষ্ঠানিকভাবে আলাদা হয়ে গেল ২০০৮ সালে। আন্তর্জাতিক ন্যায় বিচারালয়ের অনুমোদন সহ। পশ্চিমের মদতে। যদিও মিলোসেভিচ-হীন সার্বিয়া ততদিনে পশ্চিম শক্তিদের অনুগত অনুচরে রূপান্তরিত হয়েছে। বলা হলো, এটাই শেষ। অন্যদের জন্য অনুসরণযোগ্য উদাহরণ নয়। কিন্তু অনুকরণ হলো। জর্জিয়াতে, তারপর ইউক্রেনে। এবার পশ্চিমের প্রতিক্রিয়া অন্য রকম। আর যারা সাম্প্রতিককালে ইউগোস্লাভিয়া, ইরাক, আফগানিস্তান, লিবিয়া, তিন মহাদেশে আগ্রাসন চালিয়েছে, ইউক্রেনে নিজেরাই চুক্তির ব্যবস্থা করে সে চুক্তি মানে নি, তাদের মুখে কি ক্রিমিয়াতে রুশ 'আগ্রাসনে'র নিন্দা শোভা পায়? এর মানে অবশ্য এই নয় যে পুতিন দেবতা বা ফেরেস্তা। আসলে ব্যাপারটা হলো সোভিয়েত ইউনিয়নের কবরের উপর অলিগার্কিদের দুই গোষ্ঠীর মধ্যে লড়াই। বলি সাধারণ মানুষ।

চারদিকে উত্তেজনা। ঠান্ডা যুদ্ধ কি নতুন করে শুরু হতে চলেছে? এমনকি গরম যুদ্ধ? না কি বিশ্বায়িত বিশ্বে দুই বৃহৎ শক্তির লড়াই সম্ভব নয়? বিশেষ করে যেখানে মতাদর্শগত দ্বন্দ্ব নেই। শেষ মুহূর্তে কী মিটমাট হবে? বলা কঠিন। ক্রিমিয়ার গণভোটের ফল যাই হোক না কেন, (গণভোটে ক্রিমিয়ার বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ মানুষ ইউক্রেন ছেড়ে রাশিয়ায় যোগদানের পক্ষে রায় দিয়েছেন) ফল শুভ হবে না। বিশ্বের প্রথম সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রকে খণ্ডিত করার এই পরিণাম।

সুচরিতা সেন

আর্থিক সংস্কার ও অন্তর্বর্তীকালীন বাজেট

বিদায়ী ইউপিএ সরকার ২০১৪-১৫-এর আর্থিক বছরের অন্তর্বর্তীকালীন বাজেট পেশ করেছেন। এটা লোকসভা নির্বাচনের বছর। এই নির্বাচনে ইউপিএ সরকারের সামনে সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ বিজেপি পরিচালিত জাতীয় গণতান্ত্রিক মোর্চা (এনডিএ)। তাই এই বাজেট তৈরির সময় অর্থমন্ত্রী চিদাম্বরমকে যেমন ইউপিএ সরকারের গত ১০ বছরের সফলতা-ব্যর্থতার দিকগুলিকে মাথায় রাখতে হয়েছে, তেমনই এনডিএ-র ঘোষিত আর্থিক নীতির 'জনপ্রিয়' দিকগুলিও হিসেবের মধ্যে রাখতে হচ্ছে। এছাড়া রয়েছে কয়েকটি অর্থনৈতিক বাধ্যবাধকতা। এই অর্থনৈতিক বাধ্যবাধকতার দুটি দিক—একটি দীর্ঘকালীন নীতির দিক আর অন্যটি আশু প্রয়োজনের দিক। যদিও অন্তর্বর্তীকালীন বাজেটে নীতির ক্ষেত্রে খুব বেশি কিছু করার থাকে না, তবুও দীর্ঘকালীন অর্থনৈতিক নীতির বৈশিষ্ট্য মেনেই এই বাজেট তৈরি করতে হয়। এই দীর্ঘকালীন নীতির মূল গতিমুখ নির্দিষ্ট হয় আর্থিক সংস্কারকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার বাধ্যবাধকতা থেকে।

গত প্রায় তিন দশক ধরে উন্নয়নশীল দেশের অর্থনীতিকে বিশ্ববাজারের সঙ্গে পুরোপুরি ও বাধাহীনভাবে যুক্ত করে দেওয়ার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। বিশ্বব্যাঙ্ক, আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডার ও বিশ্ববাণিজ্য সংস্থার প্রবর্তিত নানান আর্থিক ও বাণিজ্য নীতির প্রয়োগের মাধ্যমে উন্নত দেশগুলি উন্নয়নশীল দেশগুলির ওপর তাদের আর্থিক প্রাধান্যকে আরো জোরদার করার চেষ্টা চালাচ্ছে। উন্নয়নশীল দেশের প্রাকৃতিক সম্পদের ব্যবহারে যেমন নিয়ন্ত্রণ আনছে তেমনই এইসব দেশের কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য, জল, জমি, জঙ্গল— সমস্ত ক্ষেত্রে অনুপ্রবেশের ও নিয়ন্ত্রণ বিস্তারের রাস্তা তৈরির চেষ্টা চালাচ্ছে। এইসব দেশের অর্থনীতিকে বিশ্ববাজারের সঙ্গে পুরোপুরি যুক্ত করে দেওয়া হলো এই নিয়ন্ত্রণ বিস্তারের আর এক পথ। এই পথকে মসৃণ করার আর এক নাম হলো আর্থিক সংস্কার। নিয়ন্ত্রণহীন খোলাবাজার, উৎপাদন, বিনিয়োগ, বিপণন, খুচরো কি বড় ব্যবসা, যোগাযোগ, পরিষেবা, শিক্ষা, স্বাস্থ্য সবক্ষেত্রে দেশি-বিদেশি বেসরকারি পুঁজির নিয়ন্ত্রণহীন প্রবেশ বিচরণ ও বৃদ্ধির পথকে সুগম করা— এই নীতির মূল কথা। খোলাবাজার অর্থনৈতিক কাঠামোর মধ্যে যে পুঁজিকেন্দ্রিক উন্নয়ন মডেল পৃথিবী জুড়ে চালু হয়েছে, অবিরত পুঁজি সঞ্চয় ও বিনিয়োগই এর শেষ কথা। পুঁজি ও আর্থিক বৃদ্ধির এই প্রক্রিয়া সম্পূর্ণভাবে বেসরকারি বিনিয়োগ ও বেসরকারি উদ্যোগের ওপর নির্ভরশীল হবে। বেসরকারি দেশি বা বহুজাতিক পুঁজির মধ্যে বাধাবন্ধহীন

প্রতিদ্বন্দ্বিতা এই অর্থনীতির চালিকাশক্তি। কিন্তু পুঁজিকেন্দ্রিক উন্নয়নের এই মডেল থেকে এমন কোনো প্রক্রিয়া সৃষ্টি হয় না যা অবধারিতভাবে দারিদ্র, অসাম্য, বেকারত্ব দূর করে অধিকাংশ মানুষের জন্য উন্নততর জীবনযাত্রা সুনিশ্চিত করতে পারে। ফলে এই প্রক্রিয়া অনুসরণ করেও সরকার তার অস্তিত্ব রক্ষার তাগিদে আলাদাভাবে মানুষের শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কর্মসংস্থান, দারিদ্র দূরীকরণ, খাদ্য সুরক্ষা ইত্যাদির জন্য পাশাপাশি কর্মসূচি নিতে বাধ্য হয়। যদিও তা নিতান্তই অপ্রতুল।

পুঁজিকেন্দ্রিক উন্নয়নের যে মডেল উন্নত দেশগুলি অনুসরণ করে সেই উন্নয়ন প্রক্রিয়ার বিশেষ পর্যায়ে অর্থনৈতিক মন্দা একটি অবধারিত পরিণতি হিসেবে দেখা দেয়। গত পাঁচ বছর ধরে বিশ্বের উন্নত দেশগুলি যে আর্থিক মন্দার কবলে পড়েছে আন্তর্জাতিক বাজার মারফত সেই মন্দার আঁচ উন্নয়নশীল দেশগুলিকেও প্রভাবিত করেছে। ভারতীয় অর্থনীতিও এই মন্দার প্রভাব সম্পূর্ণ এড়িয়ে যেতে পারেনি। এর ফলশ্রুতিতে বৈদেশিক ফাটকা পুঁজি ও উৎপাদক পুঁজির দ্রুত বহির্গমন ঘটে যা বিনিয়োগের শ্লথগতি, ডলারের মূল্যে টাকার ক্রমাগত অবমূল্যায়ন ও আমদানিকৃত সামগ্রীর দামে অস্বাভাবিক বৃদ্ধি ঘটায়। ফলে যেসব দেশি উৎপাদনক্ষেত্র আমদানিকৃত যন্ত্রপাতি ও প্রকৌশলের ওপর নির্ভরশীল সেসব ক্ষেত্রে উৎপাদন ব্যয়ে বিপুল পরিমাণ বৃদ্ধি ঘটে ও উৎপাদন ব্যাহত হয়। আবশ্যিক আমদানির ক্ষেত্রে বিপুল পরিমাণে বিদেশি মুদ্রার বহির্গমন ঘটে। এ সমস্ত কিছুর ফলে বাণিজ্য ঘাটতি, ক্রমবর্ধমান ঋণ ও সুদের বোঝা, বিদেশী মুদ্রার মজুত ভাণ্ডারের ক্ষয়, তীব্র মুদ্রাস্ফীতি এবং একই সঙ্গে শিল্প-বাণিজ্য ক্ষেত্রে নিম্নগতি সাম্প্রতিক কালে ভারতীয় অর্থনীতিকে বিপর্যস্ত করে তুলেছে। গত ২০১১ থেকে ২০১৩-র মধ্যে ভারতীয় শিল্পক্ষেত্রে, বিশেষ করে মূলধনী ও ভোগ্যপণ্যের উৎপাদন ক্ষেত্রে, বিনিয়োগ ও উৎপাদনে উল্লেখযোগ্য হ্রাস ঘটেছে। সংগঠিত শিল্পে উৎপাদন ও কর্মসংস্থানে বৃদ্ধির হার ক্রমাগত কমেছে। ফলে সার্বিক উন্নয়ন বৃদ্ধির হারেও নিম্নমুখী প্রবণতা দেখা দিচ্ছে। অন্যদিকে প্রকৃতি নির্ভরতার কারণে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির হারে সাময়িক ওঠাপড়ার সঙ্গে দীর্ঘকালীন নিম্নমুখী প্রবণতা, কৃষিতে স্থির পুঁজির বিনিয়োগ হ্রাস, কৃষি জমির ক্রমাগত খণ্ডীকরণ, গ্রামীণ অর্ধবেকার, প্রচ্ছন্ন বেকার ও অত্যন্ত নিম্ন আয়ের অসংগঠিত কাজকর্মে যুক্ত মানুষের সংখ্যা ও অনুপাতের বিপুল বৃদ্ধি, মাথাপিছু খাদ্যশস্যের প্রাপ্যতার দীর্ঘকালীন নিম্নগতি ও খাদ্যদ্রব্যের বিপুল মূল্যবৃদ্ধি— গত ১০ বছরে ইউপিএ সরকারের অনুসৃত সংস্কারমুখী অর্থনীতির এটাই হয়েছে পরিণতি।

এই অবস্থায় নির্বাচনকে সামনে রেখে ইউপিএ সরকার নানাবিধ চাপের মধ্যে পড়েছে। একদিকে সংস্কারমুখী অর্থনীতিকে আরও জোরদার ও ব্যাপকভাবে অনুসরণ করে সরকারের সংস্কারমুখী ভাবমূর্তিকে আরও স্পষ্ট করার জন্য চাপ, অন্যদিকে দারিদ্র, কর্মহীনতা, সংগঠিত শিল্পে কর্মসংস্থান, ছোট ও মাঝারি শিল্প ও অন্যান্য কর্মক্ষেত্রগুলিতে জীবিকা সুনিশ্চিত করা, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ইত্যাদি ক্ষেত্রগুলিকে আরও বেশি করে সাধারণ মানুষের নাগালের মধ্যে নিয়ে আসা, খাদ্য সুরক্ষা সুনিশ্চিত করা, খাদ্যসামগ্রীর মূল্যবৃদ্ধি রোধ ইত্যাদি নানা আবশ্যিকতার চাপ; একদিকে সংস্কারপন্থীদের জন্য খোলামেলা বাণিজ্যনীতি, পুঁজির মসৃণ আগমন সুনিশ্চিত করা, অন্যদিকে বিজেপি পরিচালিত জাতীয় গণতান্ত্রিক মোর্চার ঘোষিত 'স্বদেশি' নীতির সঙ্গে টেক্কা দিয়ে দেশীয় পুঁজি ও শিল্পক্ষেত্রগুলিকে মদত দেওয়ার চাপ।

আর্থিক সংস্কারকে সামনে রেখে চিদাম্বরম তাঁর অন্তর্বর্তীকালীন বাজেট পেশ করলেন। এতে পরিকল্পিত অর্থনীতি ও রাষ্ট্রের ভূমিকা কমানোর সাধারণ দিকনির্দেশটি অনুসরণ করা হয়েছে, পরিকল্পনা খাতে বরাদ্দের পরিমাণ বিপুলভাবে কমেছে ও তুলনায় পরিকল্পনা বহির্ভূত নানা দিকে বরাদ্দ অনেক বেশি রাখা হয়েছে। পরিকল্পনা বহির্ভূত খাতের মধ্যে একটি বড় ব্যয় প্রতিরক্ষা খাতে মূলধনী ব্যয়, যা শতকরা ১০ ভাগ বাড়ানো হয়েছে। বাজেটে খাদ্য, সার ও জ্বালানি খাতে ভরতুকি সামান্য বাড়ানো হয়েছে। বিশেষ করে ইউপিএ সরকারের খাদ্য সুরক্ষা আইনের কথা মাথায় রেখে খাদ্যে ভরতুকি সামান্য বাড়ানো হলেও খাদ্যের তুলনায় প্রতিরক্ষা অনেক বেশি গুরুত্ব পেয়েছে। দেশের অভ্যন্তরে আর্থিক নীতি জনগণের মধ্যে অসন্তোষ তৈরি করতে থাকলে সীমান্তবর্তী দেশগুলির সঙ্গে বিরোধ ও যুদ্ধ পরিস্থিতি সৃষ্টি করে সাধারণ মানুষের দৃষ্টি সরিয়ে রাখা যে কোনো শাসনের কাছে একটি পুরনো রাজনৈতিক চাল; আবার প্রতিরক্ষা খাতে মূলধনী ব্যয় বাড়িয়ে অনেক সময়ে মূলধনী শিল্পজাত দ্রব্যের কৃত্রিম চাহিদা সৃষ্টি করা হয়ে থাকে— যাতে অর্থনীতি সাময়িকভাবে কিছুটা চাঙ্গা হতে পারে। এক্ষেত্রে প্রতিরক্ষা খাতে বর্ধিত বরাদ্দ কীভাবে ব্যয় করা হবে, তা থেকেই শাসকদলের উদ্দেশ্য বোঝা যাবে। সংস্কারের কথা মাথায় রেখে ভরতুকির পরিমাণ জিডিপি-র ২.২ শতাংশ থেকে ১.৯ শতাংশে নামানো হয়েছে। পরিকল্পনা বহির্ভূত ব্যয়ের একটি বড় অংশ যাবে ঋণ পরিশোধ খাতে। সুদের বিপুল বোঝা বাজেটে কর মাধ্যমে আয়ের একটি বড় অংশ কেটে নেবে। এই বাধ্যবাধকতাগুলির সঙ্গে রয়েছে পুঁজিকেন্দ্রিক উন্নয়ন মডেল যে বৈষম্য সৃষ্টি করেছে অথবা ব্যাপক সংখ্যক মানুষর জন্য গ্রহণযোগ্য জীবিকা সুনিশ্চিত করতে ব্যর্থ হয়েছে— তার থেকে উদ্ভূত রাজনৈতিক সামাজিক সমস্যাগুলিকে সাময়িকভাবে মোকাবিলা করার বাধ্যবাধকতা। ফলে সংখ্যালঘু ও জনজাতি উন্নয়ন, গৃহনির্মাণ, নারী ও শিশুকল্যাণ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ, দারিদ্র দূরীকরণ, মানবসম্পদ উন্নয়ন, গ্রামোন্নয়ন ইত্যাদি খাতে চলতি কর্মসূচির প্রয়োজন অনুসারে বরাদ্দ রাখা হয়েছে। এছাড়া নারী সুরক্ষার জন্য 'নির্ভয়া' তহবিল গঠন কল্পে বরাদ্দ রাখা হয়েছে। ব্যাঙ্ক

পরিষেবাকে আরও বিস্তৃত করার জন্য যে পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে তা রূপায়ণকল্পে বাজেটে বরাদ্দ নির্দিষ্ট করা হয়েছে। সম্পূর্ণ মহিলা পরিচালিত মহিলাদের জন্য ভারতীয় মহিলা ব্যাঙ্ক স্থাপন ও এই খাতে ব্যয়বরাদ্দ রাখা হয়েছে। চিদাম্বরম ব্যাঙ্ক মারফত গ্রাম ও শহরে গৃহনির্মাণ ঋণ ও কৃষি ঋণের জন্য বরাদ্দ রেখেছেন, কৃষি ঋণের ওপর কার্যকর সুদ শতকরা ৪ ভাগ করা হয়েছে। ঋণের পরিশোধ সুনিশ্চিত করার জন্য নানারকম ছাড়ের কথাও ঘোষণা করা হয়েছে। সংখ্যালঘু সম্প্রদায়, স্বনির্ভর গোষ্ঠী ইত্যাদিদের জন্য ঋণের পরিমাণ কিছুটা বাড়ানো হয়েছে। শিক্ষাখাতে ঋণের সুদের ক্ষেত্রেও কিছু ছাড় ঘোষণা করা হয়েছে।

পুঁজির অবাধ সঞ্চালন সুনিশ্চিত করার জন্য বিভিন্ন ঋণপত্র, বন্ড ইত্যাদির বাজারের আরও উদারীকরণের যে পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে, এই বাজেটে সেই উদারীকরণ প্রক্রিয়াকে সহায়তা দেওয়ার কথা ঘোষণা করা হয়েছে, বিদেশি পুঁজি যাতে আরো সহজভাবে ভারতীয় মুদ্রায় ঋণপত্রে বিনিয়োগ হতে পারে তার ব্যবস্থা রাখার কথা বলা হয়েছে। চিদাম্বরম কর বিন্যাসে কিছু পরিবর্তন ঘটিয়েছেন, প্রথমত সংবিধানসম্মতভাবে অর্থমন্ত্রীকে ফিনান্স কমিশনের ফরমুলা অনুযায়ী রাজ্যের জন্য বরাদ্দ বাড়াতে হয়েছে। রাজ্য পরিকল্পনা খাতে যে পরিমাণ বরাদ্দ বৃদ্ধি ঘটানো হয়েছে কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা খাতে সেই পরিমাণ বরাদ্দ হ্রাস করা হয়েছে। এইভাবে দেশের সামগ্রিকভাবে উন্নয়নখাতে সরকারি উদ্যোগকে সীমিত রাখার চেষ্টা করা হয়েছে। এটি উন্নয়নের যে নতুন মডেল অনুসরণ করা হচ্ছে তার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ। এই নতুন মডেলে বস্তুগত উন্নয়নের ক্ষেত্রটি বেসরকারি হাতে ছেড়ে দিয়ে সরকারকে জনকল্যাণমুখী কাজকর্মে মনোযোগ কেন্দ্রীভূত করার কথাই বলা হচ্ছে। এছাড়া কেন্দ্রীয় সরকার প্রতিরক্ষা, পরিবহন, যোগাযোগ ব্যবস্থা ইত্যাদির যত পরিকাঠামো উন্নয়ন ক্ষেত্রে নিজেদের কাজকর্ম সীমাবদ্ধ রাখতে চাইছে। কর বিন্যাসে যে পরিবর্তন আনা হয়েছে তাতে দেখা যাচ্ছে মূলধনী দ্রব্য এবং ভোগ্যপণ্য উৎপাদনকারী শিল্পগুলিকে কিছুটা চাঙ্গা করার চেষ্টা করা হয়েছে। এইসব ক্ষেত্রে উৎপাদন শুল্ক বেশ কিছুটা কমানো হয়েছে। গাড়ি শিল্পকে চাঙ্গা করার জন্য ছোটগাড়ী, বড়গাড়ী, স্কুটার ইত্যাদি গাড়ি শিল্পের বিভিন্ন বিভাগে উৎপাদন শুল্ক কমানো হয়েছে। অন্যদিকে কিছু কিছু দেশি উৎপাদনক্ষেত্রকে উৎসাহ দেওয়ার জন্য মূলধনী দ্রব্যের আমদানী শুল্ক হ্রাস ঘটানো হয়েছে। চালের পরিবহন ও গুদামজাত করণের পরিষেবার ওপর শুল্ক ছাড় ঘোষণা করা হয়েছে। মুদ্রা ছাপানোর কাগজ তৈরির দেশি উৎপাদনক্ষেত্রে আমদানিকৃত উপকরণ সামগ্রীর ওপর শুল্ক ছাড় দেওয়া হয়েছে। এইভাবে চিদাম্বরম আর্থিক সংস্কারের শ্লোগান ও মোদীর 'স্বদেশী' শ্লোগান দুটিকে মেলানোর চেষ্টা চালিয়েছেন। তাঁর সরকারের সংস্কারপন্থী ভাবমূর্তি বজায় রেখে ছোট শিল্প ও দেশি শিল্প সংস্থাকে মদত দেওয়ার অভিপ্রায় তুলে ধরে মোদীর 'স্বদেশি শ্লোগান'-এর কিছুটা মোকাবিলা করতে চাইছেন। স্বদেশি শিল্পকে মদত দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর বাজেটের ঘাটতি পূরণের জন্য তিনি যে বৈদেশিক পুঁজির সরাসরি বিনিয়োগের ওপর নির্ভর করবেন সে কথাও ঘোষণা করেছেন।

এক কথায়, এই অন্তর্বর্তীকালীন বাজেটে সংস্কারমুখী দীর্ঘকালীন আর্থিক নীতির সঙ্গে আশু রাজনৈতিক প্রয়োজন ও অর্থনৈতিক বাধ্যবাধকতাকে মেলানোর একটা চেষ্টা করা হয়েছে।

অপরাজিতা মুখার্জী

ডেপুটেশনেও ভয়?

গত ৭ ফেব্রুয়ারি আমি আর বন্ধু রাজশ্রী গিয়েছিলাম কামদুনির মানুষরা কেমন আছেন তা জানতে। প্রতিবাদী মঞ্চ, শান্তি রক্ষা কমিটি, অপরাজিতার পাড়া ঘোষপাড়ার মানুষ সবার সঙ্গেই দেখা হলো। শান্তি রক্ষার সভায় অপরাজিতার সদ্য চাকুরিপ্রাপ্ত ভাইয়ের সঙ্গেও কথা হলো। সব দেখেশুনে মনে হলো, ভালো নেই কামদুনি। অনেক বন্ধুর সঙ্গে কথা বললাম। এপিডিআর-এর রাংতা মুনশির সঙ্গে কথা বলার জন্য ওকে ফোন করব, তার আগেই ওর ফোন— ''কৃষ্ণাদি, কামদুনির ঘটনা নিয়ে আমরা কবে ডেপুটেশন দিতে মহাকরণ গিয়েছিলাম?'' বললাম, ''১০ জুন, ২০১৩, সোমবার''। ও ফোনের ওপাশ থেকে বলল, ''দেখো, আজ ৯ ফেব্রুয়ারি ২০১৪, ঠিক আটমাস পর ডেপুটেশন দেওয়ার কারণে আমাদের বাড়িতে পুলিশ ওয়ারেন্ট নিয়ে হাজির। বলা সত্ত্বেও আমাকে অ্যারেস্ট করছে না।'' বললাম, ''তোকে ওরা টার্গেট করল কেন?'' ও হাসতে হাসতে বলল, ''নিশ্চিন্ত থেকো না, আমার নাম ৬ নম্বরে, তোমরাও আছো।''

পরে খোঁজ নিয়ে দেখা গেল, ১৫ জনের নামে এফআইআর দায়ের করেছে পুলিশ, আর এদের মধ্যে ৮ জনের নামে চার্জশিট দেওয়া হয়েছে। চার্জশিটে ১৪৩, ১৪০এ, ১৪৯ ও ২৮৩ ধারা দেওয়া হয়েছে। কেসের ডেট দেওয়া হয়েছে ২১/১/২০১৪। ৮ জনের নাম : অনুরাধা তলোয়ার, বোলান গঙ্গোপাধ্যায়, শাশ্বতী ঘোষ, কৃষ্ণা বন্দ্যোপাধ্যায়, রাংতা মুনশি, জয়িতা দাস, রূপশ্রী ও সোমা মুখার্জি। ১৯ ফেব্রুয়ারি সোমার বাড়িতে গিয়ে সোমাকে অ্যারেস্ট করে পুলিশ। বিকেলে ব্যাংকশাল কোর্ট থেকে জামিন দিয়ে দেয়। ধারাগুলি সবই জামিনযোগ্য।

১০ জুন মহাকরণে কী ঘটেছিল তা জানাটা জরুরি।

গত ৭ জুন বারাসাত থানার কামদুনি গ্রামের অপরাজিতাকে ধর্ষণের পর খুন করা হয়। সংবাদমাধ্যমে এ খবর প্রচারিত হওয়ার পরপরই আমরা ঠিক করি প্রতিবাদ জানাতে হবে। আমরা নারী ও মানবাধিকার কর্মীরা স্থির করি,

পুলিশমন্ত্রীর কাছে দাবিপত্র নিয়ে যাব। পুলিশমন্ত্রী এ কারণে যে, পুলিশের গাফিলতিতে এ ধরনের ঘটনা বারবার ঘটছে। ১০ জুন আমরা মহাকরণের কিছুটা দূরে, যেখানে ১৪৪ ধারা নেই সেখানে মিলিত হই। এরপর আমরা মিছিল করে মহাকরণের দিকে রওনা হই। পুলিশ আমাদের জিজ্ঞাসা করে, মুখ্যমন্ত্রী তথা পুলিশমন্ত্রীর কাছে ডেপুটেশনে যাচ্ছেন আপনারা, অ্যাপয়েন্ট-মেন্ট করা আছে তো? আমরা বলি, কী করে থাকবে? এ ঘটনা যে ঘটবে, তা তো আগে জানা ছিল না। যারা ধর্ষণ করে হত্যা করেছে তারা আমাদের তো আগে জানায় নি। সে কারণে অ্যাপয়েন্টমেন্ট-এর প্রশ্ন নেই। পুলিশ চুপ করে যায়। মহাকরণের সামনে যাওয়ার পর পুলিশ বলে, এতজন মিলে তো যাওয়া যাবে না। আপনারা ৫ জন চলুন। আমরা সেই কথামতো দাবিপত্র নিয়ে ৫ জন পুলিশি পাহারায় ওপরে যাই। অন্য মেয়েদের পুলিশ নিচে থাকতে বলে।

আমরা যাওয়ার পর ওখানকার অফিসাররা বলতে থাকেন, আপনারা সিএ-র সঙ্গে দেখা করে আপনাদের দাবিপত্র তাকে দিতে পারেন। আমরা বলি, না, আমরা কোনও আমলাকে দেব না। পুলিশ তথা মুখ্যমন্ত্রী আমাদের নির্বাচিত প্রতিনিধি, তাঁর সঙ্গেই কথা বলতে চাই। নানারকম টালবাহানা করে ৩/৪ ঘণ্টা আমাদের বসিয়ে রাখেন কিন্তু দাবিপত্র নেন না। তখন আমরা ওখানকার আধিকারিকদের বলি, উনি নিলেন না, আমরা কিন্তু সংবাদমাধ্যমকে জানাতে বাধ্য হচ্ছি।

আমরা সংবাদমাধ্যমকে বলি, ''উনি ক্ষমতায় আসার আগে যেখানেই ধর্ষণ হতো নিজে সেখানে ছুটে যেতেন। বিরোধিতা করতেন। চপলা সর্দারের ঘটনায় মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসুর ঘরের সামনে বসে বিক্ষোভ দেখান। সিঙ্গুরের তাপসী মালিকের ধর্ষণ ও হত্যার দিনটি (১৮ ডিসেম্বর) আজও পালন করেন। নন্দীগ্রামের ধর্ষণে আহত রাধারানি আড়িকে নিয়ে সারা ভারত পরিক্রমা করেছিলেন। সবই ঠিক আছে। কিন্তু আজ যখন ওঁর মুখ্যমন্ত্রীত্বে প্রশাসন চলছে, সেই সময় একটি প্রথম প্রজন্মের কলেজ পড়ুয়া মেয়ের ধর্ষণ ও মৃত্যুতে তাঁর নীরবতা আমাদের অন্যরকম ভাবাচ্ছে।''

২১ ফেব্রুয়ারি জামিন নেওয়ার পর সংবাদমাধ্যম জিজ্ঞেস করায় এটাই বললাম, ''ধর্ষণের পর খুনের বিরোধিতা করে নারী ও মানবাধিকার কর্মীরা কয়েকটি দাবি নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিল। দেখা তো করলেনই না, উপরন্তু তাদের বিরুদ্ধে ওয়ারেন্ট ইস্যু করে তৃণমূল মন্ত্রীসভা কি একটু হাস্যকর হয়ে উঠলো না?''

নাকি হাস্যকর কিছু নয়, এটা সমস্ত রকম প্রতিবাদের কণ্ঠ রুদ্ধ করার চেষ্টার অঙ্গ— কখন কোন্ প্রতিবাদ সরকারের আসন টলিয়ে দেয়, বলা তো যায় না!

কৃষ্ণা বন্দ্যোপাধ্যায়

পস্কো আন্দোলন : ভবিষ্যৎ কোন পথে?

সম্প্রতি ন্যাশনাল গ্রিন ট্রাইবুনালের সিদ্ধান্ত ও মীনা গুপ্তা কমিটির ফাইন্ডিং অমান্য করে উড়িষ্যার পস্কো প্রকল্পকে কেন্দ্রীয় সরকার পরিবেশগত ছাড়পত্র দিয়েছে। কেন্দ্রীয় সরকারের পরিবেশ ও বন মন্ত্রক দক্ষিণ কোরিয়ার প্রেসিডেন্ট পার্ক জিয়ান হে-র ভারত সফরের প্রাক্কালে পস্কো প্রকল্পকে এই সবুজ সংকেত দেয়। উল্লেখ্য, এদেশের ন্যাশনাল গ্রিন ট্রাইবুলাল কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভার দেওয়া পস্কো ছাড়পত্রের উপর স্থগিতাদেশ জারি করে নতুন একটি কমিটির দ্বারা এই প্রকল্পের পূর্ণাঙ্গ পর্যালোচনা করার নির্দেশ দেয়। আর কেন্দ্রীয় সরকারের পরিবেশ ও বন দপ্তর দ্বারা গঠিত মীনা গুপ্তা কমিটি এই প্রকল্পকে পরিবেশ আইন, বন সংরক্ষণ আইন, উপকূল আইন ও দেশের চলতি আইনের বিরোধী বলে মত জানিয়ে এই প্রকল্পকে বেআইনি ঘোষণার পক্ষে মত দিয়েছে।

কেবলমাত্র কয়েকটি গ্রাম উচ্ছেদের প্রশ্ন নয়, পস্কো প্রকল্প ভারতবর্ষে বহুজাতিক কোম্পানির এযাবৎকালের অন্যতম বৃহৎ হস্তক্ষেপ, যা এদেশের সার্বভৌমত্ব, পরিবেশ, আদিবাসী কৃষি ও মৎস্যজীবীদের স্বার্থে সরাসরি আঘাত হানছে। এই প্রকল্পটিকে *সেজ*-এর আওতাভুক্ত করে দেশের মধ্যে এক নিঃশুল্ক বিদেশ গড়ার একটি প্রস্তুতি এটি। দ্বিতীয়ত, পারাদ্বীপে প্রাইভেট পোর্ট গড়ার এই উদ্যোগ বর্তমান সরকারি বন্দরের গুরুত্ব কমিয়ে দেবে। পাশাপাশি, জটাধারী মোহনায় হাজার হাজার মৎস্যজীবীদের জীবিকা অর্জনের রাস্তা বন্ধ হবে এই প্রস্তাবিত বন্দর গড়ার কারণে। তৃতীয়ত, দৈনিক কয়েক কোটি লিটার পানীয় জল মহানদী থেকে তুলে নেওয়ার মাধ্যমে সেখানকার পাঁচটি জেলার কৃষিকাজের জলসেচ ব্যবস্থাকে এই প্রকল্প স্তব্ধ করে দেবে। রাজধানী ভুবনেশ্বরেও দেখা দেবে পানীয় জলের সংকট। চতুর্থত, উড়িষ্যার উৎকৃষ্ট খনিজ ভাণ্ডার অতি অল্প দিনে নিঃশেষিত হবে, যা পস্কো অভাবনীয় স্বল্প মূল্যে হস্তগত করতে চলেছে। পঞ্চমত, জগৎসিংপুরের ৩০ হাজার মানুষ জীবনজীবিকা থেকে উচ্ছেদ হওয়ার পাশাপাশি ধ্বংস হবে বিরল জীববৈচিত্র্য সম্পন্ন খণ্ডাধারের আদিম জনজাতি পাউড়ি ভুঁইয়া মানুষেরা।

এই প্রকল্পকে ঘিরে দেশের স্বার্থ বিরোধী এরকম অসংখ্য প্রশ্ন থাকা সত্ত্বেও নবীন পট্টনায়েকের বিজু জনতা দল, প্রাক্তন জোটসঙ্গী বিজেপি ও কেন্দ্রের কংগ্রেস চালিত মনমোহন সরকার এই প্রকল্পকে সবুজ সংকেত দিতে এত উদগ্রীব কেন তাই এখন মানুষের প্রশ্ন। কেন্দ্রীয় সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীন দুটি কমিটি জানিয়েছে যে, উড়িষ্যার রাজ্য সরকার পরিবেশ ও বনাঞ্চল আইনকে এক্ষেত্রে অমান্য করেছে। ইতিমধ্যে চুক্তিতে উল্লেখিত পাঁচ বছর সময় অতিক্রান্ত হয়ে গেছে। কিন্তু দক্ষিণ কোরিয়ার নিয়ন্ত্রক ও ভারতের স্ট্র্যাটেজিক পার্টনার মার্কিন

যুক্তরাষ্ট্র এই প্রকল্পের অনুমোদনের জন্য তৎপরতা চালাতে শুরু করলে ২০১১ থেকে মনমোহন সরকার শর্তসাপেক্ষে এই প্রকল্পটিতে অনুমোদন দেয়। তারপর থেকে জগৎসিংপুরে আবারও পুলিশি সন্ত্রাস সহযোগে জবরদস্তি অধিগ্রহণের কাজ চলতেথাকে। পাশাপাশি চলতে থাকে গণ-প্রতিরোধ। স্থানীয় গ্রামসভায় সর্বসম্মতিক্রমে প্রকল্প খারিজের প্রস্তাব গৃহীত হলেও সরকার তা মানতে নারাজ।

২০১২ সালের ৩০ মার্চ প্রফুল্ল সামন্ত বনাম কেন্দ্রীয় সরকার মামলায় ন্যাশনাল গ্রিন ট্রাইবুনাল কেন্দ্রের ছাড়পত্রের ওপর স্থগিতাদেশ জারি করে নতুন কমিটি গঠন করে পূর্ণাঙ্গ পর্যালোচনার নির্দেশ দেন। কেন্দ্রীয় সরকার ও উড়িষ্যার রাজ্য সরকার গোটা প্রকল্পটিকে নানা ভাগে বিভক্ত করে আলাদা আলাদা ছাড়পত্র দিয়ে পস্কোকে সুবিধা দেওয়ার চেষ্টা চালিয়ে গেছে। আকরিক উত্তোলন, বন্দর স্থাপন, টাউনশিপ গঠন, পানীয় জল উত্তোলন যে একই প্রকল্পের অংশ, তা আড়াল করে রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকার আসলে মানুষকে বোকা বানাতে চেয়েছে। কোন্ সমীকরণে রাহুল গান্ধী উড়িষ্যায় এসে বেদান্ত প্রকল্পের বিরুদ্ধে আদিবাসীদের পক্ষে দাঁড়ান, অথচ পরিবেশ ও বন দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী বিরাপ্পা মইলি এই বেআইনি, আদিবাসী তথা জনবিরোধী প্রকল্পকে ছাড়পত্র দিয়ে দেন তখন রাহুল নীরব থাকেন তা বুঝতে আমাদের অসুবিধা হয় না। যে নরেন্দ্র মোদী পূর্বতন পরিবেশ ও বনদপ্তরের পূর্বতন মন্ত্রী জয়ন্তী নটরাজন সম্পর্কে নটরাজন 'ট্যাক্সের' উল্লেখ করেন সেই নরেন্দ্র মোদীই আবার পস্কো প্রকল্পের ছাড়পত্র দেওয়ায় সন্তোষ প্রকাশ করেছেন। তাহলে কি তিনি বা তাঁর দল মইলি 'ট্যাক্সের' ভাগ পেয়েছেন! আবার অন্যদিকে এদেশের স্টিল জায়েন্ট টাটা গোষ্ঠী ব্যবসা বাড়ানোর প্রতিদ্বন্দ্বিতায় কী ভূমিকা পালন করছে তাও আমাদের জানতে হবে। পোহাং স্টিল কোম্পানির অংশীদারিত্ব ব্যাংক অফ নিউইয়র্ক ছাড়া আর কার কার রয়েছে তাও আমাদের বুঝতে হবে।

পস্কো প্রতিরোধ সংগ্রাম সমিতি অনেকটাই ভোটসর্বস্ব দল সিপিআই নিয়ন্ত্রিত বা প্রভাবিত থাকার কারণে এই আন্দোলনের নেতৃত্বে একটা দুর্বলতা রয়ে গেছে। এই গুরুত্বপূর্ণ আন্দোলনকে আঞ্চলিক সীমাবদ্ধতা কাটিয়ে সর্বভারতীয় স্তরে তুলে ধরে এদেশের শাসকশ্রেণীর স্বরূপ উন্মোচনের কাজটি এই আন্দোলনের নেতৃত্ব বা সিপিআই নেতৃত্ব গ্রহণ করেননি। ফলে দীর্ঘ আট বছর অতিক্রান্ত হলেও এই আন্দোলনের গুণগত কোনো উত্তরণ ঘটে নি। এতৎসত্ত্বেও বহুজাতিক কোম্পানি বিরোধী এই সংগ্রাম সাম্প্রতিক আন্দোলনের ইতিহাসে একটি উজ্জ্বল নাম। এত শক্তিশালী ও প্রভাবশালী শত্রুদের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েও তাঁরা একটুও জমি ছাড়েন নি। প্রগতিশীল শক্তিদের তাই এই আন্দোলনের পাশে আন্তরিকভাবে দাঁড়াতে হবে। সংগ্রামরত মানুষ যেন শেষ হাসি হাসতে পারে, তার দায়িত্ব গ্রহণ করতে হবে।

প্রদীপ রায়

ডাঃ সমীর বিশ্বাসের বিরুদ্ধে সমস্ত মামলার নিঃশর্ত প্রত্যাহার চাই

''আমি আমার কর্তব্য ও আমার রোগীদের মাঝখানে ধর্ম, জাতীয়তা, জাতি, দলগত রাজনীতি ও সামাজিক অবস্থানকে বিবেচনায় আসতে দেব না'' —এই শপথ নিয়ে ডাক্তাররা চিকিৎসক-জীবন শুরু করেন। রোগী তাদের কাছে রোগীই। তার লিঙ্গ, ধর্ম, জাতি, সামাজিক-অর্থনৈতিক অবস্থান বা রাজনৈতিক পরিচয় ডাক্তারের বিবেচ্য নয়। বয়স ও লিঙ্গ অবশ্য চিকিৎসার প্রয়োজনে জানতে হয়। ধর্ম বা সামাজিক-অর্থনৈতিক অবস্থা জানাও চিকিৎসার স্বার্থে প্রয়োজনীয় হতে পারে। কিন্তু রাজনৈতিক অবস্থান জানা কোনোভাবেই ডাক্তারের কাজ নয়। চিকিৎসকের যেটা কাজ, আসানসোলের অবসরপ্রাপ্ত ডাক্তার সমীর বিশ্বাস সে কাজটি করে আসছিলেন দীর্ঘকাল ধরে, সুনামের সঙ্গে। জানা গেছে, তিনি গরিব রোগীদের সেবা করছিলেন। টাকার চেয়ে রোগীর রোগমুক্তিতেই তাঁর আগ্রহ ছিল বেশি।

আজকের টাকা-সর্বস্ব সমাজে এই মানুষগুলোই সমাজকে মনুষ্য বসবাসের উপযুক্ত করে রাখেন। কিন্তু তাতে কী, রাষ্ট্রের আবার এ ধরনের মানুষকে বিশেষ পছন্দ নয়। টাকার পেছনে ঘোরো, একটু-আধটু দুর্নীতি করো, বেশিও করতে পারো যদি না পড়ো ধরা— সেসব ঠিক আছে। এই সমাজের জন্য তুমি আদর্শ। কিন্তু অন্য রকম আদর্শের গেরো থাকলেই তুমি রাষ্ট্রের জন্য বিপজ্জনক। তাই বোধহয় ২০১৩ সালের ১১ ফেব্রুয়ারি গ্রেপ্তার হলেন সমীরবাবু। অভিযোগ? তিনি মাওবাদীদের চিকিৎসা করতেন।

শুধু কামাওবাদীদের চিকিৎসা করা যাবে, মাওবাদীদের চিকিৎসা করা যাবে না— এরকম কোনো আইন আজ পর্যন্ত এদেশে নেই। প্রকৃতপক্ষে ডাক্তারের কাছে যেতে হলে এখনও পর্যন্ত কোনো পরিচয়পত্র নিয়ে যেতে হয় না। নাম? বয়স? এই প্রশ্নগুলোর উত্তর শুনেই লেখা হয়। তারপর নির্দিষ্ট চিকিৎসার প্রশ্নে চলে যাওয়া হয়। অবশ্য রোগীর শরীরে এমন কোনো আঘাতের চিহ্ন (বা বিষক্রিয়া বা অন্য ধরনের কিছু) যদি পাওয়া যায় যা থেকে মনে হয় যে রোগীর ওপর হত্যার প্রচেষ্টা চলেছে, বা তিনি আত্মহত্যার চেষ্টা করেছেন, সেটা অবশ্য পুলিশে জানানো ডাক্তারের কর্তব্য। তা না হলে রোগী আসলে কে, মাওবাদী কিনা, পুলিশের খাতায় তার নাম আছে কিনা- এগুলি জানা বা তা নিয়ে চিন্তা করা ডাক্তারের কাজ নয়। বরং রোগীর ধর্ম বা রাজনৈতিক বিশ্বাসের কারণে তাকে চিকিৎসা না দেওয়াটাই চরম অনৈতিক।

ডা: বিশ্বাস মাওবাদীদের চিকিৎসা করতেন কিনা আমরা জানিনা। কিন্তু এটা জানি যে মাওবাদীদের চিকিৎসা করাটা কোনোভাবেই অপরাধ বা বেআইনি নয়। অথচ এই কারণ

এর পর ২৮ পৃষ্ঠায়

প্রবন্ধ

ভারতীয় সংবাদপত্র ও গণতান্ত্রিক অধিকার

সুমন্ত্র বন্দ্যোপাধ্যায়

জনমত তৈরির ক্ষেত্রে গণমাধ্যমের ভূমিকা বহু বিতর্কিত। এর সঙ্গে জড়িত অনেকগুলি জটিল প্রশ্ন— *প্রথম*, আজকের ভারতীয় ধনতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় 'সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতা' বা Freedom of the Press নামধেয় গণতান্ত্রিক অধিকার কতটা সাংবাদিকদের নিরপেক্ষ বিবরণী পেশ করার স্বাধীনতা, না কতটা সংবাদপত্র মালিকদের স্বার্থপর উদ্দেশ্যের প্রচার ও তাদের পক্ষে অস্বস্তিকর খবর চেপে যাওয়ার স্বাধীনতা? *দ্বিতীয় প্রশ্ন*, সংবাদপত্র জগতের এই অভ্যন্তরীণ অসম পারস্পরিক সম্পর্কের পরিপ্রেক্ষিতে আজকের সংবাদপত্রগুলি কী পরিমাণে সাধারণ মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার সংরক্ষণ ও সম্প্রসারণ করতে সক্ষম? *তৃতীয় প্রশ্ন*, সংবাদ পরিবেশনার স্বাধীনতার নামে যে সব স্বার্থান্বেষী রাজনৈতিক গোষ্ঠী সংবাদপত্রের মাধ্যমে গুজব ছড়িয়ে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা প্ররোচিত করছে, তারা কি জনগণের গণতান্ত্রিক অধিকার ও আমাদের সাংবিধানিক ধর্মনিরপেক্ষ রাজনীত লঙ্ঘন করছে না? *চতুর্থ প্রশ্ন*, নয়া উদারনৈতিক বা neo-libral অর্থনৈতিক পরিকল্পনার কাঠামোতে আজকের সংবাদপত্রগুলি কি Consumerist বা ভোগবিলাসী মূল্যবোধের বিজ্ঞাপন-এর দালাল রূপে পরিণত হচ্ছে?

এই কয়েকটি সমস্যা নিয়ে এই আলোচনা। প্রথম প্রশ্ন, অর্থাৎ সংবাদপত্র মালিকানার ভূমিকা প্রসঙ্গে কিছু তথ্য উল্লেখযোগ্য। দেখা যাচ্ছে, গত নব্বুই-এর দশক থেকে আজ— ইংরেজি ভাষা ভিত্তিক সংবাদপত্র-এর প্রচার ছাপিয়ে উঠেছে vernacular বা স্থানীয় ভাষাভিত্তিক সংবাদপত্রের কাটতি। বিভিন্ন প্রদেশের রাজধানী ও শহরগুলি থেকে এই সব খবরের কাগজ প্রকাশিত হচ্ছে। এবং এদের মালিক স্থানীয় কোন ব্যবসাদার বা বানিয়া গোষ্ঠী, বা প্রভাবশালী রাজনৈতিক নেতা। যেটা লক্ষণীয়, এই মালিকেরা কেবল একটা কেন্দ্র থেকে মাত্র একটি সংবাদপত্র বার করে ক্ষান্ত নয়। ব্যাপক বিস্তৃতির জন্য এরা মফঃস্বল থেকে স্থানীয় সংস্করণ এবং নানা ধরনের সাময়িক পত্রিকা ছেপে একটা পরস্পর-সম্বদ্ধ যুক্ত ধারাবাহিক newspaper chain তৈরি করেছে। ভারতীয় সংবাদপত্রের করণাধ্যক্ষ-র (Registrar of Newspapers) তথ্য অনুযায়ী এই ধরনের প্রবল ক্ষমতাশীল সংবাদপত্র মালিক শ্রেণী (যাদের বলা হয় Common Ownership Units অর্থাৎ একই মালিকানায় বহুবিধ শিল্পসংস্থা) বিশেষ করে উত্তর ভারতের ব্যাপক হিন্দি-ভাষী অঞ্চলে, মহারাষ্ট্রে এবং দক্ষিণ ভারতে তামিল ও তেলেগুভাষী পাঠক সমাজে ক্রমশই তাদের বাজার বিস্তার করছে। সংবাদ পরিবেশনের ক্ষেত্রে এই জাতীয় স্বার্থান্বেষী ব্যবসায়িক ও রাজনৈতিক গোষ্ঠীর একচেটিয়া আধিপত্য সাধারণ মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকারকে লঙ্ঘন করে নানাভাবে। উত্তরভারতে এবং গুজরাটেও দেখা গেছে কিভাবে স্থানীয় ভাষায় ছাপা এইসব পত্রিকাগুলি গুজব ছড়িয়ে পাঠকদের প্ররোচিত করেছে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায়।

এইসব সংবাদপত্রগুলি আর এক ধরনের কায়দা অবলম্বন করে যাকে বলা যেতে পারে damming of news অর্থাৎ কোন খবরকে বাঁধ দিয়ে রুদ্ধ করা। যেমন উত্তরভারতের মফঃস্বল অঞ্চলে প্রায়শই যা ঘটে। কোন এক সংবাদপত্রের সাংবাদিক ঘুরতে ঘুরতে আবিষ্কার করে এক 'মাফিয়া'র দল বেআইনিভাবে জঙ্গলের গাছ কেটে কাঠ পাচার করছে। সে যখন এই ঘটনার বিবরণী তার সম্পাদককে পাঠায়, তখন তাকে বলা হলো— "চেপে যাও!" কারণ, ঐ 'মাফিয়া' সেই সংবাদপত্রের মালিক গোষ্ঠীর, নয় এক জাতি-গোষ্ঠীভুক্ত (জাতি-আনুগত্য উত্তর ভারতে প্রায় একটা কুসংস্কার...), নয় ঐ মালিকদের টাকা দিয়ে বা ভয় দেখিয়ে বশ করেছে।

শুধু মফঃস্বলের বা vernacular ভাষাভিত্তিক সংবাদপত্রকে দোষ দিচ্ছি না। Mainstream Press অর্থাৎ মহানগরী-ভিত্তিক সংবাদপত্র জগৎ কি ধোয়া তুলসী পাতা? *Times of India*-র মতো প্রখ্যাত সংবাদপত্রও paid news অর্থাৎ টাকার বিনিময়ে কোন এক নির্বাচনী প্রার্থীর প্রচারের অভিযোগে সনাক্ত হয়েছে। মহানগরীগুলি থেকে প্রকাশিত এইসব বৃহত্তর সংবাদপত্র আর এক ধরনের পরিবেশনায় নিযুক্ত। ক্রোড়পত্র বা Supplement-এর নামে এরা মঞ্চ-তারকা মার্কা সংস্কৃতির প্রচারে একান্ত সক্রিয়। উঁচু মহলের কর্তাব্যক্তি, শিল্পপতি, রাজনৈতিক নেতা, চিত্রতারকাদের খানাপিনার চোখ-ধাঁধানো বর্ণনার মাধ্যমে ভোগবিলাসী শৌখিনতাকে লোকপ্রিয় করে তোলার চেষ্টা হচ্ছে।

প্রশ্ন উঠতে পারে, ভারতীয় সংবাদপত্র কি কেবল নঞর্থক ভূমিকা পালন করছে? গ্রামাঞ্চলে দরিদ্র মানুষের সমস্যার খবরও তো বের হয়। এইসব খবর পড়েই তো পাঠকসমাজ জানতে পারে এদেশের শিশুদের ব্যাপক অপুষ্টির কথা, দলিত কৃষকদের ওপরে উচ্চবর্ণের লোকেদের হামলা ঘটনা, এবং কখনও কখনও তার বিরুদ্ধে প্রতিরোধের কাহিনী, সরকারি প্রশাসনে চুরি-জোচ্চুরি, পুলিশের অত্যাচার ও নারী-নিগ্রহের ইতিহাস। নিঃসন্দেহে এই জাতীয় সংবাদের প্রকাশের ফলে জনমত অনেক সচেতন হয়ে ওঠে। অন্যান্য উন্নয়নশীল দেশ, এমনকি সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলির তুলনায় (যেখানে

এর পর ৩২ পৃষ্ঠায়

প্রবন্ধ

ধর্ষকদের নয়, প্রতিবাদীদের বিরোধিতা করছে সরকার

সঞ্জীব আচার্য

নিঝুম সন্ধ্যায় গ্রামে সালিশি সভা বসেছে। বিচার চলছে, মোড়লের বিচার। অভিযোগ— গ্রামের এক কিশোরী ভিন্ন সম্প্রদায়ের এক যুবকের সাথে প্রণয়ে লিপ্ত। অভিযুক্ত যুবক ও কিশোরীকে পিছমোড়া করে বাঁধা রয়েছে। অবশেষে রায়— কিশোরীকে শাস্তি দিতে হবে। শাস্তি হচ্ছে গণধর্ষণ। মোড়ল মেয়েটাকে গ্রামের যুবকদের হাতে তুলে দিয়ে বললো— 'লে ফূর্তি করে লে'। আর যুবকটির সাজা হলো ২৫ হাজার টাকা জরিমানা। মোড়লের নিদানমতো গ্রামের বারোজন যুবক সারারাত পাশবিক অত্যাচার চালালো মেয়েটির উপর। পরের দিন মেয়েটিকে গ্রামে আটকে রাখলো। নৃশংস এই ঘটনার বিবরণ শুনে মনে হবে পঞ্চদশ শতকের কোনও গ্রাম্য বিচারসভা অথবা হরিয়ানার কোনও খাপ পঞ্চায়েতের ঘটনা। কিন্তু না, ঘটনাটা এই ২০১৪ সালের এবং রাজ্যটা পশ্চিমবঙ্গ। বিশ্বাস করতে অসুবিধা হলেও এটাই দুঃখজনক ও বিপজ্জনক বাস্তব। গত ২০ শে জানুয়ারি ২০১৪ বীরভূমের লাভপুরে ঠিক এই ঘটনাই ঘটে গেছে। গণধর্ষণের পর একদিন আটক থাকার পর মেয়েটি গত ২২শে জানুয়ারি বুধবার মাকে নিয়ে পুলিশের কাছে অভিযোগ জানায়। পুলিশ গ্রামের মোড়ল বলাই মান্ডি সহ ১৩ জনকে গ্রেপ্তার করে আদালতে পেশ করে। পুলিশ অভিযুক্তদের নিজেদের হেফাজতে না চাওয়ায় এসিজেএম পীযুষ ঘোষ অভিযুক্তদের ১৪ দিনের জেল হেফাজতের নির্দেশ দেন।

এই ঘটনার পর রাজ্যজুড়ে তোলপাড়। মোড়লের বিচার এবং পুলিশের ধর্ষণের ঘটনায় এ হেন উদাসীনতা— এ দুটি বিষয়ই রাজ্য তথা দেশবাসীকে স্তম্ভিত করেছে। এসপি বদল কিংবা পুলিশের নিষ্ক্রিয়তা নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর উষ্মা— রাজ্যবাসীকে কোনও ভরসা যোগাতে ব্যর্থ। সুপ্রিম কোর্ট স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে তদন্তের নির্দেশ দিয়েছে। জাতীয় মহিলা কমিশন উদ্বেগ প্রকাশ করেছে। সারা দেশে নারী নির্যাতন বা ধর্ষণের ঘটনার কেন্দ্র 'পশ্চিমবঙ্গ'। অপরাধীরা বেপরোয়া। পুলিশ উদাসীন— বা সঠিকভাবে বললে ঘটনা চাপা দিতে মরিয়া। শাসকদলের কেউ কেউ অভিযুক্ত, শাসকদল প্রতিবাদীদের উপর খড়্গহস্ত। সমাজ বিমূঢ়— ক্ষীণ প্রতিবাদী, শঙ্কিত।

কিন্তু এই অবস্থা কেমন করে হলো? ধাপে ধাপে আজ এই অবস্থায় পৌঁছেছে। পার্ক স্ট্রীট-কাটোয়া-খরজুনা-রানীনগর-কামদুনি -মধ্যমগ্রাম-গাইঘাটা-লাভপুর-— পশ্চিমবঙ্গের কয়েকটি শহরের নাম নয়— পরপর কয়েকটি স্টেশন। গাড়িটার নাম হতে পারে নির্যাতিতা এক্সপ্রেস অথবা অবক্ষয়ী ফাস্ট প্যাসেঞ্জার। যে গাড়ীর যাত্রাপথে ছড়ানো ধর্ষিতার মৃতদেহ, নির্যাতিতার বিরুদ্ধে চক্রান্তের অভিযোগ, প্রতিবাদীদের বিরুদ্ধে প্রশাসন ও শাসকদলের চোখরাঙানি। গাড়ির গন্তব্য এক অবক্ষয়ী পশ্চিমবঙ্গ। প্রতিটি স্টেশনে নির্যাতিতা অথবা ধর্ষিতা এক নারী। রকমারি প্রতিক্রিয়া প্রশাসনের— শাসক দলের।

পার্ক স্ট্রীটের ঘটনায় ধর্ষিতা মহিলা সাহস করে এগিয়ে এসে থানায় অভিযোগ জানান। সাধারণত ধর্ষণের ঘটনা চেপে যাওয়াই যখন দস্তুর সেখানে এই মহিলাদের ভূমিকা প্রশংসনীয়। কিন্তু অভিযোগ জমা পড়ার পর প্রশাসন অপরাধীদের গ্রেপ্তার করার পরিবর্তে মহিলাকেই চক্রান্তকারী বলে প্রচার শুরু করল। স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রী সাংবাদিক সম্মেলনে পুলিশ কমিশনারকে পাশে রেখে মহিলার অভিযোগকে উড়িয়ে দিয়ে মহিলাকে চক্রান্তকারী বলে প্রকাশ্যে দেগে দিলেন। সিপিএমের প্ররোচনায় শিশু সরকারকে কালিমালিপ্ত করার জঘন্য চক্রান্ত। ধর্ষণের ঘটনা পিছনে চলে গেলো। সামনে চলে এলো চক্রান্তের ঘনঘটা।

এখানেই থামলো না। মাননীয় পরিবহনমন্ত্রী টিভি চ্যানেলে সান্ধ্য অনুষ্ঠানে ধর্ষিতার চরিত্র নিয়ে প্রশ্ন তুললেন। অত রাতে অভিযোগকারিণী বারে মদ খেতে গিয়েছিলেন— সুতরাং তিনি নষ্টা! সুতরাং তার ধর্ষণের অভিযোগের অত গুরুত্ব দেওয়ার দরকার নেই। শিউরে ওঠার মতো বক্তব্য। মুখ্যমন্ত্রী তথা স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর বক্তব্যকে নস্যাৎ করে দিয়ে দময়ন্তী সেন (আইপিএস) ধর্ষণের অভিযোগের সত্যতা স্বীকার করে নিয়ে বিবৃতি দিলেন। প্রত্যাশিতভাবেই তাকে পদ থেকে সরিয়ে দেওয়া হলো। এই ছিলো পার্ক স্ট্রীটে ধর্ষণের ঘটনায় প্রশাসনিক প্রতিক্রিয়া ও পদক্ষেপ। এই প্রতিক্রিয়ায় স্বভাবতই ধর্ষিতা বা নির্যাতিতাদের জন্য স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী তথা মুখ্যমন্ত্রী যে বার্তা দিলেন তা হলো— ধর্ষণের ঘটনা ঘটলেও সরকার ধর্ষণের অভিযোগকে গুরুত্ব দেবেন না বা অপরাধীদের আড়ালই শুধু করবেন না, দরকার হলে ধর্ষিতাকেই আক্রমণ করবেন— তাঁর চরিত্র নিয়ে টানাটানি করবেন। একে ধর্ষণের আশঙ্কা, তারপর অভিযোগ জানালে প্রশাসনের আক্রমণ— প্রতিটি মেয়ের সামনে এখন দু-দফা বিপদ।

তদন্তের আগেই পুলিশমন্ত্রী ঘোষণা করে দিলেন— 'চক্রান্ত'। পুলিশকে বার্তা দেওয়া হলো বর্তমান সরকার ধর্ষণের ঘটনায় পুলিশের কোনও সক্রিয় বা কার্যকর ভূমিকা দেখতে চায় না। বরং সরকার যে বক্তব্য সাজিয়ে দেবে তাকেই তদন্তের ফল হিসাবে মিলিয়ে দেওয়ার দায়িত্ব পুলিশের। এই বার্তা উপেক্ষা করলে 'দময়ন্তী'। পুলিশের নিজস্ব দুর্বলতা-অদক্ষতা-অসততার সাথে যুক্ত হলো সরকারের বার্তা। ধর্ষকের পৌষমাস। ধর্ষক-অপরাধীরাও বুঝে নিলো— ভাবমূর্তি নষ্ট হওয়ার ভয়ে

পশ্চিমবঙ্গে অপরাধ না কমলেও অপরাধের বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগ কমিয়ে আনতে সরকার বদ্ধপরিকর। সুতরাং ধর্ষণের পর তদন্ত বা শাস্তির প্রশ্নই ওঠে না। বিশেষত মহিলা যদি স্বাধীনচেতা আধুনিকা হন, তাহলে ধর্ষণ করা হয়তো সামাজিক কাজ হিসাবে গণ্য হবে! পৌষ মাস ছাড়া আর কী?

প্রশাসনের এবং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর এই বক্তব্যের পরে প্রতিবাদ হয়। মিছিল হয়। কিন্তু সরকার বধির। তদন্তের অগ্রগতি হতাশাজনক। অপরাধীদের শাস্তি পাওয়ার সম্ভাবনা প্রায় নেই। ধর্ষণের ঘটনাও রাজ্যের ভাবমূর্তির রক্ষার স্বার্থে সইয়ে নিতে হবে।

পার্ক স্ট্রীটের ঘটনার রেশ মেলাতে না মেলাতেই আবার ধর্ষণের অভিযোগ। কাটোয়ায়, ট্রেনের মধ্যে। তদন্ত শুরু হওয়ার আগেই আবার মুখ্যমন্ত্রীর রায়— এটাও চক্রান্ত। মহিলার স্বামী সিপিআইএম করতেন। অর্থাৎ আবার নতুন এক বার্তা। সিপিআইএম-এর বাড়ির মহিলারা নির্যাতন বা ধর্ষণের অভিযোগ আনলে সেটা চক্রান্ত। তদন্ত করার দরকার নেই। অপরাধীদের শাস্তি দেওয়ার দরকার নেই। ধর্ষকেরা বুঝে নিলো, আধুনিকাদের সাথে সাথে সিপিআইএম বাড়ির মেয়েরাও তাদের জন্য বরাদ্দ হলো। পুলিশ বুঝলো, ধর্ষিতারও রঙ দেখতে হবে।

স্থানীয় তৃণমূল নেতা প্রকাশ্যে জানিয়ে দিলেন, ধর্ষিতা মহিলার স্বামী ছিলেন তৃণমূল কর্মী। কোনওদিনই সিপিআইএম দল করেন নি। যথারীতি কোপে পড়লেন ঐ তৃণমূল নেতা। অর্থাৎ মুখ্যমন্ত্রীর মন্তব্য সত্যেরও উপরে। আর ধর্ষকেরা বুঝে নিলো অত্যাচারিতা স্থানীয় তৃণমূল নেতার সহায়তা পেলেও তারা নিরাপদ। শাস্তির উর্দ্ধে। কারণ ধর্ষণ হলে ভোগান্তি একটি মেয়ের, তার পরিবারের। কিন্তু ঘটনাটি প্রকাশ্যে এলে রাজ্যের তথা সরকারের তথা শাসকদলের তথা মুখ্যমন্ত্রীর ভাবমূর্তি মেঘাচ্ছন্ন হবার সম্ভাবনা। সুতরাং ধর্ষণের ঘটনায় অভিযোগ মেনে নিতে এই সরকারের আপত্তি। ফল, ধর্ষণের ঘটনা বেড়েই চললো এবং এক ধাপ এগিয়ে শুরু হলো ধর্ষণের পর ধর্ষিতাকে হত্যা।

গেদেতে স্কুলছাত্রীকে ধর্ষণের পর নৃশংসভাবে হত্যা করা হলো। রানীনগর, খরজুনা নতুন করে সাক্ষী হলো ধর্ষণের। কামদুনিতে কলেজ ছাত্রীকে ধর্ষণের পর হত্যা করলো স্থানীয় ভেড়ির সাথে যুক্ত লোকেরা। প্রশাসন-সরকারের ভূমিকায় ধর্ষণের ঘটনা মেনে নেওয়াই অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গিয়েছিলো। ব্যতিক্রম হয়ে উঠলো কামদুনি। সমস্ত গ্রাম ঐক্যবদ্ধভাবে গর্জে উঠলো। 'ক্ষতিপূরণ চাই না, অপরাধীদের শাস্তি চাই'। নেতিয়ে যাওয়া, মানিয়ে নেওয়ায় অভ্যস্থ সমাজে উষ্ণতা ফিরিয়ে আনলো কামদুনি। 'অপরাজিতার' পরিবারের পাশে ঐক্যবদ্ধ গ্রাম। শাস্তির দাবিতে। সেই উষ্ণতায় বৃহত্তর নাগরিক সমাজ, মিডিয়ার উদাসীনতার, নিস্পৃহতার বরফ গলতে বাধ্য হলো। কিছুটা আশার সঞ্চার হলো। সমাজ-মানুষ এত সহজে ধর্ষণ- হত্যা-অবমাননা মেনে নেবে না, প্রশাসন যতই অন্য বার্তা দিক না কেন। কিন্তু ধর্ষণের বিরুদ্ধে গ্রাম-নাগরিক সমাজ যত সরব হলো, প্রতিবাদ গড়ে তুললো, ততটাই আক্রমণাত্মক হয়ে উঠলো প্রশাসন-সরকার-শাসকদল। ধর্ষকদের বিরুদ্ধে নয়, প্রতিবাদীদের বিরুদ্ধে, কামদুনি গ্রামের বাসিন্দাদের বিরুদ্ধে। টুম্পা-মৌসুমীকে মাওবাদী 'তকমা' লাগিয়ে নির্যাতনের লাইসেন্স দেওয়া হলো। মিছিল সংগঠিত করার অপরাধে স্কুলের হেডমাস্টারকে শাস্তি দেওয়া হলো। কামদুনি প্রতিবাদী মঞ্চকে ভেঙ্গে দেওয়ার জন্য চললো হুমকি। আদালত চত্বরে প্রতিবাদে চললো পুলিশের লাঠি। অপরাজিতার কাকা আহত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হলেন। পরে মারা গেলেন। গ্রামে পুলিশ প্রহরা বসলো— অপরাধীদের ধরার জন্য নয়, প্রতিবাদীদের আটকানোর জন্য। হুমকি দিয়েও কাজ হলো না। তখন খাদ্যমন্ত্রী গ্রামে উন্নয়নের প্যাকেজ নিয়ে মাঠে নামলেন। ক্লাবগুলিকে টাকা দেওয়া হলো, অপরাজিতার বাড়ির দুজনকে চাকরি দিয়ে প্রতিবাদী মঞ্চ থেকে সরিয়ে আনা হলো। তৈরি হলো শান্তি কমিটি। প্রতিবাদী মঞ্চের বিরুদ্ধে সংগঠিত করার লক্ষ্যে।

প্রতিবাদী মঞ্চের নেতা ভাস্কর মন্ডলকে বাড়ি থেকে বার করে মারা হলো। এই ঘটনার এফআইআর নিতে অস্বীকার করলো পুলিশ। উল্টে আক্রান্তের বিরুদ্ধে এফআইআর হলো। অন্যদিকে, ধর্ষণে যুক্ত অপরাধীদের বাড়ির লোকজন 'ইনসাফ' নামে একটি সংগঠনের নাম করে পুলিশের গাড়ি চড়ে নবান্নে ডেপুটেশন দিয়ে এসেছেন তৃণমূল নেতার সহযোগিতায়। দাবি, ধর্ষণে অভিযুক্তদের মুক্তি দিতে হবে। এই হলো সংক্ষেপে কামদুনিতে বর্তমান সরকারের এবং শাসকদলের অবদান।

'অপরাজিতা'র বাড়ির লোকেরা কামদুনি প্রতিবাদী মঞ্চ থেকে বেরিয়ে আসার পর গ্রামবাসীদের যারা এখনও প্রতিবাদী মঞ্চে থেকে গেছেন তাদের সকলকেই সন্ত্রস্ত করে রাখা হয়েছে। যারা ধর্ষণে অভিযুক্ত তারা শাসকদলের ছত্রছায়ায়। পুলিশ শাসকদলের আজ্ঞাবহ। সরকার এবং শাসকদলের এই উগ্র আক্রমণ যেকোনো স্থানে নারী নির্যাতন বিরোধী প্রতিবাদী কণ্ঠের বিরুদ্ধে প্রকাশ্য হুমকি। ধর্ষিতার পাশে দাঁড়ানো মানেই সরকার-প্রশাসন-শাসকদলকে চ্যালেঞ্জ জানানো! এই রকম একটা সামাাজিক বাতাবরণ তৈরি হয়েছে কামদুনির ঘটনায় সরকারি ভূমিকায়। যারা অপরাধী তারা এতে উৎসাহিত হবে এটাই তো স্বাভাবিক, এবং অপরাধের বিরুদ্ধে সংগঠিত প্রতিবাদ ক্রমশ ক্ষয়িষ্ণু হবে। হয়েছেও। তাই মধ্যমগ্রামের মতো ওইরকম ভয়াবহ ঘটনা ঘটতে পারে।

মধ্যমগ্রামে প্রথমবার ধর্ষণের পর মেয়েটি পুলিশের কাছে অভিযোগ জানায়। অভিযোগ জানিয়ে ফেরার পথে অপরাধীরা মেয়েটিকে শাসায় আবার ধর্ষণ করবে বলে এবং সত্যি সত্যিই দ্বিতীয়বার মেয়েটিকে ধর্ষণ করে। দ্বিতীয়বার ধর্ষিতা হয় শুধু মেয়েটি নয়— সমগ্র সমাজ প্রশাসন সরকার। মধ্যযুগে রঘু ডাকাতেরা চিঠি দিয়ে ডাকাতি করত, আর এই একবিংশ

শতাব্দীতে ধর্ষকেরা জানান দিয়ে সমগ্র সমাজ-প্রশাসনের নাকের ডগায় দ্বিতীয়বার ধর্ষণ করছে একটি কিশোরীকে। আটকানো যায় নি। প্রশাসন আটকাবার চেষ্টা করে নি। মেয়েটি পুলিশের কাছে সুরক্ষা চেয়েছিলো। পায় নি। অথচ আইন অনুযায়ী পুলিশ ধর্ষিতার সুরক্ষা দিতে বাধ্য। পুলিশের এই অপরাধের শাস্তি কে দেবে? রাজ্য সরকার নিজেই তো ধর্ষণের বিরুদ্ধে যে কোনও প্রতিবাদকে শত্রুতার চোখে দেখছে! সমগ্র নারী সমাজকে বুঝিয়ে দেওয়া হলো, আর অন্ধকারে লুকিয়ে চুরিয়ে নয়, প্রকাশ্যে ঘোষণা করেই ধর্ষণ করার হিম্মত রাখে ঐ বাহাদুররা— আর সমগ্র সমাজ এই বার্তা নীরবে হজম করে নিলো। কামদুনির ঘটনায় প্রতিবাদী গ্রামবাসীর বিরুদ্ধে সরকারি চোখরাঙানির ফল সমাজের এই ক্লীবত্ব— পঙ্গুতা। কামদুনিতে গ্রামবাসীরা মানবিকতার, সামাজিকতার যে নিদর্শন রেখেছে তা স্বার্থক্লিষ্ট এই সমাজে স্যালুট জানানোর মতো। কিন্তু প্রতিদানে ভাস্কর মন্ডলের মাথা ফেটেছে, মাস্টারমশাই সাসপেন্ডেড, টুম্পা-মৌসুমীরা ভয়ার্ত— তাই মধ্যমগ্রামে প্রতিবেশীরা এগিয়ে আসে নি। দুবার ধর্ষণের পরও সমাজ জাগে নি। এরপর বাড়িতে এসে হুমকি দিয়ে গেছে অভিযুক্তরা। সাহায্যের হাত এগিয়ে আসেনি। তাই ভয়ে গ্রাম ছেড়ে পালিয়ে অন্যত্র ঘরভাড়া নিতে বাধ্য হয়েছে ধর্ষিতার পরিবার। ধর্ষণের পর অভিযুক্তরা বুক ফুলিয়ে গ্রামে ঘুরছে, শাসাচ্ছে, আর ধর্ষিতার পরিবার গ্রামছাড়া! একশো টিভি চ্যানেল আছে, রাজনৈতিক দল আছে, কয়েকশো কাগজ আছে, অধিকার রক্ষার সংগঠন আছে, পুলিশ-প্রশাসন মন্ত্রী-আমলা— সবাই আছে, তবু ধর্ষিতাকে পালিয়ে বেড়াতে হয়। সীতাকে শুধুমাত্র তুলে নিয়ে গিয়েছিল রাবণ। স্পর্শমাত্র করে নি। প্রতিশোধে স্বর্ণলঙ্কা ছাড়খার করেছিলো হনুমান। কিন্তু এখন হনুমানের বড়ই অভাব।

তাও রেহাই নেই। তাড়া করে নতুন জায়গায় এসে তাকে শাসানো শুরু হয়। অবশেষে তাকে পুড়িয়ে মারে দুষ্কৃতিরা। মেয়েটি তার অন্তিম অবস্থায় পুলিশকে বয়ানে তাই জানিয়েছে। অসহায় মেয়েটি তার অভিজ্ঞতা-উপলব্ধি থেকে তার মাকে বলে গেছে, "মা তুমিও মেয়ে— তোমাকেও ওরা পুড়িয়ে মারবে। এই সমাজে মেয়েদের বাঁচার কোনও জায়গা নেই"! সত্যি কি আছে? মধ্যমগ্রামের ঘটনার পর বুকে হাত দিয়ে কজন বলতে পারবে যে কোনও দুষ্কৃতি চাইলেও আমার মেয়েকে অসম্মানের হাত থেকে বাঁচাতে পারবো? তাহলে তো মধ্যমগ্রামের ঐ মেয়েটিকেও বাঁচাতে পারতাম। কম আর্তনাদ তো সে করেনি। কম সুযোগ তো আমরা পাই নি!

এটাই বর্তমান বাস্তবতা। পার্ক স্ট্রীট থেকে যে যাত্রার শুরু, মধ্যমগ্রামে পৌঁছে এই বাস্তবতা। এরপর লাভপুরের সালিশি সভার বিচার শেষে গ্রামের কিশোরীকে গ্রামের যুবকদের হাতে তুলে দিয়ে গ্রামের মোড়ল যদি বলে, 'লে ফুর্তি করে লে'— খুব কানে লাগে না। বিস্ময়ে চমকে ওঠার মতো কিছু মনে হয় না। তথাকথিত-সভ্য-আধুনিক নাগরিক সমাজের মন-কান-বিবেক-রুচিবোধ-অনেকটাই এটার জন্য প্রস্তুত হয়ে আছে কামদুনি-মধ্যমগ্রাম-এর সৌজন্যে। ধর্ষণ তো নিছকই দুর্ঘটনা। গণধর্ষণ না হয় একটু বড় দুর্ঘটনা। অন্তত সরকারের ভূমিকায় সেইরকমই বার্তা আসছে।

ধর্ষণের পর ক্ষতিপূরণ বা সরকারি চাকরির ব্যবস্থা করাটাই এখন সরকারি পদক্ষেপের মুখ্য বিষয়। অপরাধীদের বিরুদ্ধে শাস্তির ব্যবস্থা করা— সঠিকভাবে তদন্ত-সাক্ষ্য সংগ্রহ-মেডিক্যাল টেস্ট বা সঠিক চার্জশীট গঠন বাদ। আর সামাজিক প্রতিরোধ বা প্রতিবাদ গড়ে তোলা তো রাষ্ট্রদ্রোহিতার সামিল, অতএব নিষিদ্ধ। সরকারের এই পরিণতি মেনে নিতে অসুবিধা হয়। অসুবিধা আরও বেশি হয় এই কারণে যে, বর্তমান সরকারের নেত্রী বামফ্রন্টের আমলে নারী লাঞ্ছনার প্রতিটি ঘটনায় যথাযথ সক্রিয় বিরোধিতা করেছিলেন। সরব হয়েছিলেন। বিরোধী নেত্রীর যে ভাবমূর্তিকে সম্বল করে বর্তমান সরকার গঠিত, সেই ভাবমূর্তি গড়ে ওঠার পেছনে অন্যতম অবদান মহিলাদের সম্মান রক্ষার জন্য বিরোধী থাকাকালীন বর্তমান মুখ্যমন্ত্রীর নাছোড় লড়াই। ইতিহাসের কি অদ্ভুত রসিকতা!

নন্দীগ্রামের রাধারানী আড়ি কিংবা সিঙ্গুরের তাপসী মালিক বামফ্রন্ট আমলে ধর্ষণের শিকার। সেই সময় গণ আন্দোলন দমন করার উদ্দেশ্যে একটা বড় হাতিয়ার ছিলো প্রতিবাদী গোষ্ঠীর মহিলাদের নির্যাতন ও সম্মানহানি। কিন্তু বর্তমানে নির্যাতিতাদের কেউই কোনও আন্দোলনের সাথে যুক্ত কেউ নয়। তবুও সরকার নির্যাতিতাদের পাশে দাঁড়াচ্ছে না কেন? প্রতিবাদ তো সরকারের বিরুদ্ধে নয়, ধর্ষণের বিরুদ্ধে, প্রতিরোধ তো সমাজবিরোধীদের অপরাধীদের বিরুদ্ধে— তবুও সরকার এই বিরোধিতা-প্রতিবাদকে এত শত্রুতার চোখে দেখছে কেন?

কোনও কোনও ঘটনায় স্থানীয় তৃণমূলকর্মী বা তৃণমূল নেতার ছত্রছায়ার থাকা দুষ্কৃতিদের নাম উঠে এসেছে। কিন্তু শুধুমাত্র ওদের বাঁচানোর জন্য শাসকদলের, সরকারের এই অনৈতিক ভূমিকা? নাকি আরও গভীর কোনও কারণ আছে! এমনিতে রাজনৈতিক বিরোধিতা মিটিং-মিছিল-পথসভা-প্রচার পুলিশ এবং শাসকদলের চাপে বন্ধ-প্রায়। মতপ্রকাশের স্বাধীনতা রীতিমতো খর্বিত। এই অবস্থায় ধর্ষণের বিরুদ্ধে স্বতঃস্ফূর্ত প্রতিবাদের সামাজিক পরিসরটুকুও রাখতে চাইছে না শাসকদল বা সরকার। কারণ শাসকদলের নিয়ন্ত্রণের বাইরে কোনও প্রতিবাদ— আজ ধর্ষণের ঘটনায় হলে কাল সারদা কেলেঙ্কারির বিরুদ্ধে হবে, পরশু টেট কেলেঙ্কারি নিয়ে হবে। জাগ্রত সমাজ সব শাসকদলেরই আতঙ্কের কারণ। অপরাধ দুর্নীতির বিরুদ্ধে সরকারের বা শাসকদলের কোনও লড়াই নেই। বরং তা ক্ষমতা ধরে রাখার অন্যতম হাতিয়ার। সুতরাং দরকার নির্জীব প্রতিরোধ-ক্ষমতাহীন, সব কিছু মেনে নিতে শেখা বাধ্য নাগরিক। প্রতিবাদ তাই নিষিদ্ধ এমন কি ধর্ষণের ঘটনাতেও।

প্রবন্ধ

সুন্দরবন থেকে বঙ্গোপসাগর

আনু মুহাম্মদ

আয়তনে ছোট হলেও অন্য বহু দেশের তুলনায় বাংলাদেশের অনেকগুলো বিশেষ শক্তির দিক আছে। উর্বর তিনফসলি জমি, ভূগর্ভস্থ ও উপরিস্থিত বিশাল পানি সম্পদ, নদী নালা খাল বিল, ঘন জনবসতি— সবই আমাদের সম্পদ যা অনেকের নেই। এর বাইরেও আছে সুন্দরবনের মতো অসংখ্য প্রাণের সমষ্টি এক মহাপ্রাণ। অসাধারণ জীববৈচিত্র্য দিয়ে তা সারা দেশকে সমৃদ্ধ করে, লক্ষ লক্ষ মানুষের জীবিকার সংস্থান করে, আবার প্রতিটি প্রাকৃতিক দুর্যোগে লক্ষ লক্ষ মানুষকে বাঁচায়। আমাদের আরও আছে বঙ্গোপসাগর। স্থলভাগের তুলনায় দ্বিগুণেরও বেশি আয়তনের এই সমুদ্র জানা অজানা বিশাল সম্পদের আধার। এই বিশাল সাগর শুধু সম্পদের দিক থেকে নয়, বিশ্ব যোগাযোগ ও সার্বভৌম নিরাপত্তার দিক থেকেও গুরুত্বপূর্ণ। এই বিবেচনায় বাংলাদেশ শুধু নদীমাতৃক দেশ নয়, সমুদ্রমাতৃক দেশও। আর এরপরও আমাদের বাড়তি আছে গ্যাস কয়লা সহ খনিজ সম্পদ। এত সব সম্পদ থাকা সত্ত্বেও কি একটি দেশকে গরিব বলা যায়? না। কোনো কারণ নেই গরিব থাকার। কিন্তু উন্নয়নের ধরনই এমন যে, শুধু যে মানুষ গরিব তাই নয়; আবাদি জমি, নদী, পানি, সমুদ্র, সুন্দরবন, গ্যাস কয়লা সবই একের পর এক আক্রমণের শিকার, বিপন্ন। যা আমাদের সমৃদ্ধ জীবন নিশ্চিত করতে সক্ষম সেগুলোই দেশি বিদেশি কতিপয় গোষ্ঠীর লোভের বলি হয়ে ছিন্নভিন্ন হচ্ছে।

ফুলবাড়ী প্রসঙ্গে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন কৃষিজমি নষ্ট করে খাদ্য নিরাপত্তা নষ্ট করে উন্মুক্ত খনি করা হবে না। নতুন প্রযুক্তির জন্য অপেক্ষা করতে হবে। খুবই সঠিক সিদ্ধান্ত। কিন্তু তাঁর কথা আর সরকারের নানা মহলের কাজে কোন সঙ্গতি নেই। ২০০৬ সালে রক্তাক্ত গণঅভ্যুত্থানের পর জনগণের সাথে যে 'ফুলবাড়ী চুক্তি' স্বাক্ষরিত হয়েছিল তার পূর্ণ বাস্তবায়ন এখনও হয়নি। তার ফলে লবিস্টদের তৎপরতা চলছেই। লন্ডনে ফুলবাড়ীর কয়লাখনি দেখিয়ে জালিয়াতি শেয়ার ব্যবসা চালাচ্ছে বিদেশি কোম্পানি। নতুন প্রযুক্তির জন্য, নবায়নযোগ্য জ্বালানির বিকাশের জন্য, জাতীয় সক্ষমতার দিকে মনোযোগ দিতে হবে। সেদিকে কোন উদ্যোগ নেই।

শেখ হাসিনা বলেছেন, ২০৪১ সালের মধ্যে বাংলাদেশ একটি উন্নত দেশে পরিণত হবে। খুবই সম্ভব, এর আগেই সম্ভব। কিন্তু বিশ্বে এমন কোন দৃষ্টান্ত নেই যেখানে নিজেদের খনিজ সম্পদের ওপর জাতীয় কর্তৃত্ব ছাড়া উন্নতি করতে পেরেছে। জ্বালানি সার্বভৌমত্ব জাতীয় সার্বভৌমত্ব ও উন্নয়নের পূর্বশর্ত। নিজেদের সার্বভৌম ক্ষমতা বিদেশি বহুজাতিক কোম্পানি আর দেশীয় লুটেরাদের হাতে তুলে দিয়ে কোন দেশ কার্যকর উন্নতি করেছে? এরকম কোন দৃষ্টান্ত আছে, নিজেদের জমি পানি সহ নবায়নযোগ্য ও গ্যাস কয়লা সহ অ-নবায়নযোগ্য সম্পদের সর্বনাশ করে কোন দেশ বিষচক্র থেকে বের হতে পেরেছে? না, নেই।

একতরফা নির্বাচনে যে সরকার গঠিত হয়েছে তা জোরদারভাবে সেইসব কর্মসূচি বাস্তবায়নে হাত দিয়েছে যেগুলো গত সরকারের সময়ই প্রতিরোধের সম্মুখীন হয়েছিল। পূর্বের সরকারের দায়মুক্তি আইন এখনও বলবৎ রেখে জ্বালানি ও বিদ্যুৎ খাতে সরকার আগের ধারাতেই অগ্রসর হচ্ছে। তাতে দেশের কতিপয় গোষ্ঠী এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ভারত, চীন, রাশিয়ার শাসক আর মুনাফাপ্রভুরা খুশি, কিন্তু বিপদাপন্ন বাংলাদেশ। দেশ ও জনস্বার্থ বিবেচনার কেন্দ্রে থাকলে কী করে রামপালে সুন্দরবনধ্বংসী কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র সরকারের অন্যতম অগ্রাধিকার প্রকল্প হতে পারে? কীভাবে রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র বিবেচনাযোগ্য হতে পারে? কীভাবে একের পর এক জনস্বার্থবিরোধী চুক্তি স্বাক্ষরিত হতে পারে?

সরকারি পদের দায়িত্বে থাকা কতিপয় ব্যক্তি, সুন্দরবন এলাকায় ভূমি দখলে উদগ্রীব কতিপয় দস্যু ও হাতে গোনা কয়জন ভাড়াটে বিশেষজ্ঞ ছাড়া কাউকে পাইনি যারা এই বিদ্যুৎ কেন্দ্র নিয়ে উদ্বিগ্ন নন। এটি যে সুন্দরবন ধ্বংস করবে সে ব্যাপারে তাঁরা সবাই নিশ্চিত। এসব লোকজন 'বাঙাল'কে হাইকোর্ট দেখানো'র মতো সুপারক্রিটিকাল টেকনোলজির গল্প বলেন। আমি ভারতীয় কোম্পানি এনটিপিসির কেন্দ্র শক্তিনগরে (মধ্যপ্রদেশের সিংগ্রলি অঞ্চল) তাদের কার্যক্রম দেখে এসেছি। দেখেছি উন্মুক্ত খনি ও কয়লা ভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রের কারণে কীভাবে এককালের ঘন বনজঙ্গলের এলাকা এখন বিরান, বিষাক্ত; সেখানে পানি বাতাস দূষিত। অ্যাশপন্ড বা ছাই-এর পুকুর অঞ্চলের সকল জলাধার এমনকি শেষ ভরসা কুয়ার পানি বিষাক্ত করেছে। খাদ্য উৎপাদনের উপযোগী জমি নেই। ঘরে ঘরে অসুস্থ শিশু। প্রতি তিন বাড়ির এক বাড়ির এক বাড়িতে এখন পাগল পাওয়া যাচ্ছে।

অনেকেই প্রশ্ন করেন তাহলে বিকল্প কী? আমরা বারবার বলি— সুন্দরবনের বিকল্প নাই, কিন্তু বিদ্যুৎ উৎপাদনের অনেক বিকল্প আছে। প্রথমত, যেহেতু ভারতের কোম্পানি এটি পরিচালনা করবে, যেহেতু সম্ভবত ভারতের কয়লাই এখানে ব্যবহার হবে, সেহেতু ফ্রেন্ডশীপ কোম্পানির এই কেন্দ্র ভারতেই প্রতিষ্ঠিত হোক, আমরা না হয় বিদ্যুৎ কিনবো! সেটা কি ভারতের মানুষ মানবেন? ভারতের আইন তা অনুমোদন করবে? অথবা দ্বিতীয়ত, সকল বিধি মেনে স্বচ্ছতার সঙ্গে, যদি গ্রহণযোগ্য হয়, যদি জনসম্মতি মেলে, তবে বাংলাদেশের অন্যত্র এই বিদ্যুৎ কেন্দ্র হতে পারে। অথবা তৃতীয়ত, যে পরিমাণ বিদ্যুৎ এই কেন্দ্র থেকে পাওয়া যাবে তার চাইতে বেশি বিদ্যুৎ, ২০ ভাগের ১ ভাগ অর্থে, বিদ্যমান বিদ্যুৎ কেন্দ্র মেরামত ও নবায়ন করেই পাওয়া সম্ভব। অথবা চতুর্থত, নবায়নযোগ্য বিদ্যুৎ কেন্দ্র প্রতিষ্ঠার বৃহৎ উদ্যোগ। ভারতের রাজস্থানই তার একটি ভালো

দৃষ্টান্ত। চতুর্থ পথই দীর্ঘমেয়াদে আমাদের পথ।

গ্যাসভিত্তিক বৃহৎ বিদ্যুৎ কেন্দ্র প্রতিষ্ঠায় বাংলাদেশের জন্য বিশাল উৎস হবে বঙ্গোপসাগর। এটি বাংলাদেশের জন্য এক বিশেষ সুবিধা যা বহু দেশে নেই। কিন্তু এক্ষেত্রেও ভুল ও লোভী নীতি ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত করছে। গত ১৭ ফেব্রুয়ারি বঙ্গোপসাগরে গ্যাসব্লক নিয়ে আরেকটি সর্বনাশা চুক্তি করলো সরকার। সংশোধিত 'পিএসসি (Production Sharing Contract) ২০১২' অনুযায়ী সরকার ভারতের অয়েল এ্যান্ড ন্যাচারাল গ্যাস কর্পোরেশন (ওএনজিসি বিদেশ) এবং অয়েল ইন্ডিয়ার সাথে বঙ্গোপসাগরের এসএস-৪ ও এসএস-৯ নামে চিহ্নিত ১৪ হাজার বর্গ কিলোমিটার এলাকার ২টি গ্যাসব্লকের চুক্তি সম্পাদন করেছে।

এর আগে পিএসসি ২০০৮ ও তাতে রফতানির বিধান নিয়ে আমরা প্রতিবাদ জানিয়েছিলাম। জনপ্রতিরোধ ও জনমতের চাপে পিএসসি ২০১২ তে রফতানির বিধান রাখা হয়নি। কিন্তু বর্তমান দলিলে অনেকগুলো চালাকি করা হয়েছে। বিদেশি কোম্পানিগুলোর দাবির কাছে নতি স্বীকার করে সরকার পিএসসি ২০১২ সংশোধন করেছে। তাদের কথামতো চুক্তির দলিল বা 'পিএসসি' সাজানোর পর আবারও টেন্ডার আহ্বান করা হয় এবং আগে থেকে ঠিকঠাক করা কোম্পানিগুলো তাতে সাড়া দেয়। ভারতের ওএনজিসি এবং যুক্তরাষ্ট্রের কনকো ফিলিপস এখন তালিকায়। কনকো-ফিলিপসের সাথে ৭নং গ্যাস ব্লক নিয়ে সরকার আরও একটি চুক্তি করবার অপেক্ষায়।

কোম্পানিগুলোর উচ্চ মুনাফা ও কর্তৃত্ব নিশ্চিত করতে সংশোধিত পিএসসিতে যেসব বাড়তি সুবিধা নতুন করে দেওয়া হয়েছে তার মধ্যে আছে প্রথমত, গ্যাসের ক্রয়মূল্য, অর্থাৎ বাংলাদেশ যে দামে গ্যাস কিনবে তার দাম, আগের চুক্তির তুলনায় প্রায় দ্বিগুণ বাড়ানো হয়েছে।। দ্বিতীয়ত, প্রতিবছর গ্যাসের দাম শতকরা ২ ভাগ হারে বৃদ্ধির ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। তৃতীয়ত, ব্যয় পরিশোধ পর্বে, গভীর সমুদ্রের জন্য, বিদেশি কোম্পানির অংশীদারিত্ব শতকরা ৫৫ ভাগ থেকে বৃদ্ধি করে শতকরা ৭০ ভাগ করা হয়েছে। চতুর্থত, ইচ্ছামত দামে তৃতীয় পক্ষের কাছে গ্যাস বিক্রির অনুমতি দেওয়া হয়েছে।

এই চুক্তির কারণে তাই নিজের গ্যাস সম্পদ কেনার ক্ষমতা বাংলাদেশের থাকবে না, কিনতে গেলে ভয়াবহ আর্থিক বোঝার সম্মুখীন হতে হবে। এছাড়া একাধিক ব্লকে গ্যাস পাওয়া গেলে যোগান এত বেশি হবে যে রফতানি তখন অনিবার্য হয়ে উঠবে, যা শুধু এই কোম্পানিগুলোকেই লাভবান করবে। সেজন্যই কি দলিলে গ্যাস রফতানির উপর কোন নিষেধাজ্ঞা রাখা হয়নি? চার বছর আগে সংসদে উত্থাপিত 'খনিজ সম্পদ রফতানি নিষিদ্ধ আইন'ও পাশ করা হয়নি কি সেজন্যই? উল্টে রফতানি নীতিতে খনিজ সম্পদ রফতানির বিধান রাখা হয়েছে।

'পুঁজির অভাব'-এর যুক্তি তুলেই স্থলভাগ ও সমুদ্রে একের পর গ্যাসব্লক বিদেশি কোম্পানির হাতে তুলে দেওয়া হচ্ছে। গ্যাস অনুসন্ধান ও উত্তোলনে নাকি 'বিপুল পরিমাণ' অর্থের প্রয়োজন, আর তা বাংলাদেশের পক্ষে বহন করা সম্ভব নয়। কত সেই পরিমাণ? সর্বশেষ চুক্তি অনুযায়ী ওএনজিসি ৮ বছরে বিনিয়োগ করবে প্রায় ১৪ কোটি ডলার বা ১১০০ কোটি টাকা, মানে বছরে গড়ে ১৩৮ কোটি টাকা। তার মানে, প্রতিবছর মন্ত্রী আমলাদের গাড়ি কেনার বা বিলাসিতার খরচ একটু কমালেই সমুদ্রে গ্যাস অনুসন্ধানের টাকার যোগান হয়। তাছাড়া ওএনজিসি ৮ বছরে যে পরিমাণ বিনিয়োগ করবে তার প্রায় দ্বিগুণ অর্থ গ্যাস উন্নয়ন তহবিলে অলস পড়ে আছে। শত কোটি টাকা দুর্নীতি আর পাচারের হিসাব না হয় নাই দিলাম।

'বাংলাদেশের সক্ষমতা নাই'— বারবার এই যুক্তি তোলা হয়। কবে এই সক্ষমতা আসবে সে ব্যাপারে কি কোন কথা আছে? জাতীয় সক্ষমতা বিকাশে সরকারের কি কোন উদ্যোগ আছে? কোন সরকারের ছিলো? না। ভারতের সক্ষমতা অর্জনে কত বছর লেগেছিলো। আর বাংলাদেশের স্বাধীনতার ৪২ বছর পরেও 'আমরা পারব না'— এটাই সরকারগুলোর সার্বক্ষণিক কথা। অক্ষমতার প্রচার করে, একটি সমৃদ্ধ দেশের সম্পদ বিনাশের নানা চুক্তি হতে থাকে।

দক্ষ কোম্পানি বলে যে ওএনজিসির সাথে চুক্তি করা হয়েছে তার বিরুদ্ধে বহু অভিযোগ ভারতেই আছে। কনকো-ফিলিপস তো দুর্ঘটনার রাজা হিসেবেই পরিচিত। অথচ পিএসসিতে দুর্ঘটনার জন্য ক্ষতিপূরণের ধারা দুর্বল করে রাখা হয়েছে। বঙ্গোপসাগরে যদি দুর্ঘটনা হয়, ক্ষতি কতদূর বিস্তৃত হবে তা চিন্তা করাও কঠিন। মাগুড়ছড়া টেংরাটিলার অভিজ্ঞতা খুবই তিক্ত। কোন সরকার এই ক্ষতির জন্য মার্কিন শেভ্রন ও কানাডিয়ান কোম্পানি নাইকোর কাছ থেকে আমাদের প্রাপ্য ৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলার আদায়ের উদ্যোগ নেয়নি।

এত সবের পরও প্রশ্ন করা হবে, এর বিকল্প কী? আমাদের তো গ্যাস লাগবে! বিকল্প নিশ্চয়ই আছে কিন্তু তাতে কমিশনভোগীদের সুবিধা নাই। আমরা সরকারকে এই ধরনের আত্মঘাতী চুক্তি স্বাক্ষরের পরিবর্তে জাতীয় সংস্থার সক্ষমতা কাজে লাগিয়ে, প্রয়োজনে নির্দিষ্ট কিছু ক্ষেত্রে সাবকন্ট্রাক্টের মাধ্যমে, জাতীয় স্বার্থ সমুন্নত রেখে গ্যাস অনুসন্ধান ও উত্তোলন কার্যক্রম গ্রহণের দাবি জানিয়েছি বারবার। শতভাগ জাতীয় মালিকানার অধীনে নির্দিষ্ট কাজে বিদেশি কোন দক্ষ কোম্পানিকে দায়িত্ব দেওয়া, বিদেশি বা প্রবাসী বিশেষজ্ঞদের এসব কাজে যুক্ত করায় তো কোন অসুবিধা নেই। জাতীয় কমিটির ৭ দফায় বিস্তারিত কর্মসূচির রূপরেখা দেয়া হয়েছে। কোন সরকারের এতে আগ্রহ দেখা যায় না।

জনস্বার্থ যদি উন্নয়ন চিন্তার কেন্দ্রে থাকে তাহলে ধ্বংসের বিকল্প ঠিকই পাওয়া সম্ভব। কিন্তু তার জন্য কমিশন থেকে জনগণের দিকে ঘাড়টা ঘোরাতে হবে। না ঘোরালে জনগণকেই ব্যবস্থা নিতে হবে। বাংলাদেশ এই দেশের মানুষের, দেশি-বিদেশি লুটেরাদের নয়।

প্রবন্ধ

শিক্ষায় অরাজকতা

সমরেশ মিত্র

১৭ ডিসেম্বর, ২০১১। সাউথ সিটি কলেজের সান্ধ্য বিভাগের কলেজটির নাম প্রফুল্লচন্দ্র কলেজ। কলেজের ছাত্র এবং ইউজিসি এবং শিক্ষা দপ্তরের অর্থানুকূল্যে কলেজে কলেজে আইন মোতাবেক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হওয়ার কথা, যা কলেজের 'সোস্যাল' নামে পরিচিত। গোল বাধলো সেই সোস্যাল-এর কার্ড বিলি নিয়ে। কলেজের তৃণমূল ছাত্রপরিষদের ইউনিট দাবি তোলে যে সোস্যালের কার্ড-এর ৫০ শতাংশ তাদের দিতে হবে— এই কার্ড তারা তাদের ইচ্ছামতো বিভিন্ন স্থানে বিলি করবে। আইনমতে নির্বাচিত ছাত্র সংসদের প্রতিনিধিবৃন্দ শিক্ষকের উপস্থিতিতে প্রতিটি শ্রেণীকক্ষে গিয়ে কলেজের বৈধ ছাত্রদের মধ্যে কার্ড বিলি করার কথা। এই নিয়ম মেনে যখন বিভিন্ন শ্রেণীকক্ষে কার্ড বিলি চলছিল, তখন প্রফুল্লচন্দ্র কলেজের তৃণমূল ইউনিটের কয়েকজন পরিচিত কর্মী প্রায় সশস্ত্র হামলা চালায়। এই হামলায় চারজন ছাত্রছাত্রী গুরুতর আহত হয় এবং তাঁদের নিকটবর্তী হাসপাতালে স্থানান্তরিত করতে হয়। পাঁচদিন হাসপাতালে কাটিয়ে সেই ছাত্রছাত্রীরা বাড়ি ফেরে।

২০১১-র মে মাসে নির্বাচনের মাধ্যমে সবে পরিবর্তন ঘটেছে। মেদিনীপুরের গোয়ালতোড়ের পিংবনী প্রাথমিক স্কুলের জনপ্রিয় শিক্ষক শ্রী বিপ্লব মল্লিকের ওপর স্থানীয় তৃণমূল নেতৃত্ব ফতোয়া জারি করে বলে যে তাঁর বিদ্যালয়ে আসা নিষেধ। একদিন তাঁর ওপর চড়াও হয় স্থানীয় তৃণমূলের গুন্ডাবাহিনী। শ্রী মল্লিক পুলিশের সাহায্য চাইলে স্থানীয় থানা তাঁকে নিরাপত্তার আশ্বাস দেয়। আশ্বস্ত শ্রী মল্লিক একদিন যখন শ্রেণীকক্ষে পড়াচ্ছেন, তখন স্থানীয় একজন পরিচিত তৃণমূলের নেতার নেতৃত্বে শ্রেণীকক্ষের ভেতরই তাঁর ওপর চড়াও হয়। আহত বিপ্লববাবুকে হাসপাতালে নেওয়া হয়। পুলিশের কাছে প্রত্যক্ষদর্শীরা জবানবন্দী দিয়ে এফআইআর করা সত্ত্বেও আজও তদন্ত শুরু হয়নি। যার নেতৃত্বে বিপ্লববাবু হেনস্থা হন, তিনি স্থানীয় তৃণমূল সাংসদের ঘনিষ্ঠ।

সেপ্টেম্বর ২০১১। দত্তপুকুর সার্কেলের অধীন হেরেনপোতা কামিগাছি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক সহিজুদ্দিন আহমেদ। প্রাথমিক শিক্ষকদের জন্য সরকার আয়োজিত একটি শিক্ষা-শিবিরে যোগ দেওয়ার জন্য তিনি বারাসতের কদম্বগাছিতে আমন্ত্রিত হয়ে যখন সেখানে উপস্থিত হন তখন স্থানীয় তৃণমূলের গুন্ডা আজিজ তাঁর কলার ধরে টানতে টানতে একটি গলির মধ্যে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা চালায়। কিন্তু স্থানীয় মানুষদের প্রবল বাধার সম্মুখীন হয়ে আজিজ রণে ভঙ্গ দেয়। থানায় আজিজের বিরুদ্ধে এফআইআর রুজু করা হলেও পুলিশ কোনও পদক্ষেপ নেয়নি।

সেপ্টেম্বর ৮, ২০১১। বেহালার মথুরানাথ বিদ্যাপীঠের একদল ছাত্র স্কুল চত্বরের বাইরে ডিএসও-র ডাকা একটি কর্মসূচিতে যোগ দেওয়ার জন্য মিছিল করে রওয়ানা দেয়। এই ঘটনার পর স্থানীয় বহিরাগত একদল তৃণমূল কর্মী বিদ্যালয়ে চড়াও হয়ে স্কুলে ব্যাপক ভাঙচুর চালায় এবং শিক্ষকদের নির্মমভাবে প্রহার করে।

সেপ্টেম্বর ৯, ২০১১। নবগ্রাম হীরালাল কলেজের ছাত্রছাত্রীদের স্থানীয় তৃণমূল নেতা হুমকি দেয় যে তার ছেলেকে যেন 'বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায়' কলেজের তৃণমূল ছাত্র পরিষদের সচিব হিসেবে 'নির্বাচিত' করা হয়। ছাত্রছাত্রীরা এই হুমকিকে উপেক্ষা করলে কলেজ ছুটির পর তৃণমূল ছাত্র পরিষদের কর্মীরা কলেজ ঘিরে ফেলে ছাত্রছাত্রী নিগ্রহ শুরু করে। তারা ছাত্রদের তাড়া করে কোন্নগর স্টেশন পর্যন্ত ধাওয়া করে। শেষ পর্যন্ত স্টেশনে এসে তারা কিছু ছাত্রছাত্রীকে আটকে দেয়। স্টেশন চত্বরে যখন ছাত্রীদের পেটে লাথি মারা শুরু করে তখন স্টেশনের ফল-বিক্রেতা এবং হকাররা গুন্ডাদের হটিয়ে দেয়।

২৬শে এপ্রিল, ২০১২। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্বাচিত ছাত্র ইউনিয়নের ঘর বেআইনিভাবে দখল করার জন্য হামলা চালায় কিছু বহিরাগত স্থানীয় মস্তানদের সহায়তায় হঠাৎ গজিয়ে ওঠা তৃণমূল ছাত্র পরিষদ। কিন্তু সাধারণ ছাত্রছাত্রীদের প্রতিরোধের মুখে পড়ে তখন তারা সাময়িকভাবে পিছু হটে। সেদিন বিকেলে বেশ কিছু বহিরাগত গুন্ডাদের সহায়তায় কিছু তৃণমূল ছাত্রপরিষদ কর্মী বালিগঞ্জ বিজ্ঞান কলেজের কয়েকজন ছাত্রকে গড়িয়াহাট আইটিআই-এর বিপরীতে প্রকাশ্য রাস্তায় বেদম প্রহার করে। গুন্ডাদের আক্রমণে একজন ছাত্র জ্ঞান হারায়। গড়িয়াহাট থানায় এফআইআর করতে গেলে তারা প্রথমে তা নিতে অস্বীকার করে। কিন্তু স্থানীয় মানুষের জমায়েত দেখে পরে অভিযোগ গ্রহণ করলেও আজও এই ঘটনার তদন্ত শুরু করেনি।

জুলাই ৩০, ২০১১। রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন আধিকারিক শ্রী বাসুদেব নন্দী কিছু ছাত্র দ্বারা বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরেই আক্রান্ত হন। তাঁর অপরাধ, তিনি কয়েকজন ছাত্রকে তাদের মোটরবাইক সরিয়ে নিতে অনুরোধ করেছিলেন। ছাত্ররা তাঁকে আক্রমণ করে তাঁর বুকে ঘুসি মারে। গুরুতর অবস্থায় তাঁকে আরজিকর হাসপাতালে নিয়ে গেলে তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করা হয়।

২০১১-র স্বাধীনতা দিবসের প্রাক্কালে। বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের আধিকারিকদের আবাসন 'অভয় কানন'-এর সদর দরজার মুখ আটকে স্থানীয় তৃণমূল কর্মীরা আড্ডা দেয় এবং নানা অসামাজিক কাজকর্মে লিপ্ত হয়। ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ের বরিষ্ঠ আধিকারিক এবং পরিচিত সঙ্গীতশিল্পী শ্রী শুভপ্রসন্ন নন্দী মজুমদার ঐ আবাসনের অন্যান্য বাসিন্দাদের এইসব অসামাজিক কাজকর্মের বিরুদ্ধে সংগঠিত করার চেষ্টা করেছিলেন। ঐদিন বর্ধমানের রাস্তায় একাধিক পুলিশের উপস্থিতিতে তৃণমূলের গুন্ডারা শ্রী নন্দী মজুমদারের ওপর আক্রমণ চালায়। আক্রমণকারীদের হাত এড়িয়ে এক সময় শ্রী নন্দী মজুমদার বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে এসে মাননীয় উপাচার্য মহাশয়কে তাঁর দুর্দশার কথা জানিয়ে প্রতিবাদস্বরূপ অনশন শুরু করেন। তাঁর সঙ্গে যোগ দেন উপাচার্য এবং সহ-উপাচার্য। বিশ্ববিদ্যালয়ের আধিকারিকবৃন্দ এই ঘটনার প্রতিবাদে ১ ঘণ্টা 'পেন ডাউন' ধর্মঘট পালন করেন। শিল্প-সাহিত্যের সঙ্গে জড়িত রাজ্যের নানা প্রান্তের মানুষরা তীব্র প্রতিবাদ জানান। প্রতিবাদের ঢেউ ওঠে অসম ও উত্তর-পূর্ব ভারতে এবং বাংলাদেশে।

জানুয়ারি ৫, ২০১২। রায়গঞ্জ বিশ্ববিদ্যালয় কলেজের অস্থায়ী অধ্যক্ষ ডঃ দিলীপ দে সরকারকে হেনস্থা করে স্থানীয় তৃণমূল নেতৃত্ব। দূরদর্শনে দেখা যায় যে স্থানীয় তৃণমূল নেতা শ্রী তিলক চৌধুরী এই গুন্ডামিতে নেতৃত্ব দিচ্ছেন। পরবর্তী সময়ে এই কলেজের আরও দুজন অস্থায়ী অধ্যক্ষ এই একই ধরনের হেনস্থার শিকার হয়েছেন।

১৯শে ফেব্রুয়ারি, ২০১৪। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাজাবাজার প্রাঙ্গণে কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের অধ্যাপক ভাস্কর দাস তাঁর বিভাগের মধ্যেই ছাত্রদের দ্বারা নিগৃহীত হন। ছাত্ররা তাঁর বসার ঘরে ঢুকে তাণ্ডব চালায়। তাঁর অপরাধ, তিনি কয়েকজন 'নেতৃস্থানীয়' ছাত্রকে 'সংযত' হতে অনুরোধ করেছিলেন।

২০১১-র ১৭ই ডিসেম্বর যাদবপুর বিদ্যাপীঠের প্রধান শিক্ষকের ওপর হামলা হয়। তিনি অকৃতকার্য ছাত্রদের পরবর্তী শ্রেণীতে উন্নীত করতে রাজি হননি। তৃণমূল কংগ্রেসের প্রাক্তন বিধায়ক শ্রী আরাবুল ইসলাম ভাঙ্গর কলেজের একজন অধ্যাপিকাকে জলভর্তি গ্লাস ছুঁড়ে মারেন। আরাবুল সাহেব আবার ঐ কলেজের পরিচালন সমিতির সভাপতি! সম্প্রতি ১৫ মার্চ ২০১৪ উচ্চ মাধ্যমিকের ইংরাজি পরীক্ষার দিন এই আরাবুল ইসলাম পরীক্ষা চলকালীন সময়ে স্থানীয় একটি স্কুলে দলবল নিয়ে ঢুকে ছাত্রদের সাহায্য করার জন্য শিক্ষকদের নির্দেশ দেন। পরীক্ষাকেন্দ্রের ভারপ্রাপ্ত শিক্ষক সংসদ সভাপতির নিকট আরাবুলের বিরুদ্ধে অভিযোগ জানালে, শিক্ষামন্ত্রী উল্টে উক্ত শিক্ষিকার বিরুদ্ধেই দোষারোপ করেন। স্থানীয় বিধায়ক জনাব জাভেদ খান-এর নেতৃত্বে মিলি কলেজের দুজন অধ্যাপিকাকে হেনস্থা করা হয়। উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ পরিচালন সংস্থার সভা চলার সময় জনৈক কর্মচারী মাননীয় উপাচার্যের মুখে থুথু ছিটিয়ে দেন। পশ্চিমবঙ্গ সরকার পরবর্তীকালে সেই ব্যক্তিকে উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের 'কোর্ট'-এ সরকার মনোনীত প্রতিনিধি হিসেবে প্রেরণ করেন। অবশ্য সমাজের, বিশেষত শিক্ষাজগতের সর্বস্তরের মানুষদের তীব্র প্রতিবাদে সরকার ঐ ব্যক্তির নাম প্রত্যাহার করে নেয়।

উত্তর দিনাজপুর জেলার ইটাহারের মেঘনাদ সাহা কলেজে একটি পরীক্ষা চলছে। স্থানীয় তৃণমূল নেতার স্ত্রী শ্রীমতী পম্পা পাল একজন পরীক্ষার্থী। পরীক্ষায় নকল করতে গিয়ে তিনি হাতেনাতে ধরা পড়েন এবং কলেজের অধ্যক্ষার নির্দেশে পরীক্ষায় নজরদারির জন্য ভারপ্রাপ্ত অধ্যাপক পম্পাদেবীর পরীক্ষার খাতা বাজেয়াপ্ত করেন। কিছুক্ষণ পর পম্পাদেবীর স্বামীর নেতৃত্বে একদল গুন্ডা অধ্যক্ষার ঘরে জোর করে ঢুকে তাঁর ঘর তছনছ করে এবং যে শিক্ষক নজরদারির কাজে ভারপ্রাপ্ত ছিলেন তাঁকে প্রহার করে। তৃণমূলেরই ইউনিয়ন, চুক্তি-ভিত্তিক শিক্ষক সংস্থার শিক্ষক নেতা শ্রী সুদেব রায়ও এই গুণ্ডাদের হাতে প্রহৃত হন। প্রায় একই ঘটনা ঘটে দক্ষিণ দিনাজপুরের হরিরামপুরের দেওয়ান আবদুল গণি কলেজে। নকল করতে বাধা দেওয়ায় সেই কলেজে কিছু বহিরাগত গুন্ডা, কলেজের তৃণমূল ছাত্র পরিষদের কিছু পরিচিত কর্মীর সহায়তায় সেই কলেজের বেশ কিছু শিক্ষক এবং পরীক্ষা নিয়ামক শ্রী সনাতন দাসকে প্রহার করে। এই ঘটনার জেরে ঐ কলেজের ১৯জন ছাত্রের রেজিস্ট্রেশন বাতিল করার সিদ্ধান্ত নেয় গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়।

রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় উপাচার্যের ঘরে তৃণমূল ছাত্র পরিষদের কয়েকজন নেতৃস্থানীয় কর্মী ঢুকে পড়ে তাঁকে অপমান করে এবং তাঁর ঘরে আসবাবপত্রের ওপর হামলা চালায়। পরবর্তীকালে ঐ নেতাদের কেউ কেউ ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ের এমএ দ্বিতীয় বর্ষের একজন ছাত্রীকে বিশ্ববিদ্যালয়ের গেটের বাইরে থেকে জোর করে বিশ্ববিদ্যালয়ের অভ্যন্তরের তৃণমূল ছাত্র পরিষদ পরিচালিত ইউনিয়ন দপ্তরে তুলে নিয়ে আসে। ছাত্রীটি পরে থানায় তাঁকে হেনস্থা করার অভিযোগ দায়ের করেন এবং ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ের তৃণমূল ছাত্র পরিষদের দুজন নেতাকে পুলিশ গ্রেপ্তার করতে উদ্যত হলে তারা আদালত থেকে আগাম জামিন পেয়ে যায়। এই দুজনের একজন ছাত্র আবার বিশ্ববিদ্যালয়ের বার্ষিক ক্রীড়া অনুষ্ঠানে মাননীয় উপাচার্য মহাশয়ের হাত থেকে 'বছরের সেরা ছাত্র'-র শিরোপা পেয়ে যায়!

বহু ক্ষেত্রেই দৃশ্য-মাধ্যমে দোষী ব্যক্তিদের সরাসরি বেআইনি এবং শিক্ষা-বিরোধী কাজ করতে দেখা গেছে। যেমন, রায়গঞ্জ কলেজের অধ্যক্ষ নিগ্রহ ঘটনায় নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য স্থানীয়

নেতা তিলক চৌধুরী, প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাঙচুরের ঘটনায় তৃণমূল ছাত্র পরিষদ নেতা শ্রী তমোঘ্ন ঘোষ এবং স্থানীয় পৌরপিতা শ্রী পার্থ বসু, ইটাহার কলেজের ঘটনায় একাধিক স্থানীয় তৃণমূল নেতা ইত্যাদি। প্রতিটি ক্ষেত্রে মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী বা মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী বিবৃতি দিয়ে বলেছেন ঘটনাগুলি তুচ্ছ— 'ছোটো ছেলেরা উত্তেজনার বসে কাজটা করে ফেলেছে'।

এতক্ষণ যে সমস্ত ঘটনাগুলির বর্ণনা দিলাম সেগুলি এই জাতীয় অনেকগুলি ঘটনা থেকে বেছে নিয়েছি। ঘটনাগুলি স্পষ্ট ইঙ্গিত দিচ্ছে যে শিক্ষাক্ষেত্রটি আজ সার্বিকভাবে আক্রান্ত। প্রাথমিক শিক্ষক থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, উপাচার্য থেকে স্কুলের বা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র, শিক্ষক থেকে আধিকারিক— শিক্ষার সঙ্গে যুক্ত সর্বস্তরের শিক্ষাকর্মী আজ এই পরিবর্তনের জমানায় আক্রান্ত হচ্ছেন।

শিক্ষাক্ষেত্রে এই আক্রমণ কিছু ব্যতিক্রমী ঘটনা নয়। কিন্তু এমন সার্বিক ধারাবাহিক এবং একের পর এক নিগ্রহ সেই ১৯৭২-৭৬ সময়কালের পর এই মাত্রায় দেখা যায়নি। ১৯৭২-৭৬ সময়কালে সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষ শিক্ষার ওপর এই আক্রমণের বিরুদ্ধে যাওয়ার চেষ্টা করেছিলেন, শিক্ষাক্ষেত্রে গণতান্ত্রিক কাঠামোটি রক্ষার জন্য এগিয়ে এসেছিলেন।

বামফ্রন্ট আমলেও শিক্ষক ও ছাত্র নিগ্রহের ঘটনা কম ঘটেনি। এবং তাতেও তৎকালীন শাসকদলের প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ ছিল।

কিন্তু আজকের জমানায় সত্যিই অনেক 'পরিবর্তন' দেখা যাচ্ছে। শাসকদল এবং সরকার কোনোরকম রাখঢাক ছাড়াই এই নিগ্রহের প্রশ্রয়দাতা, শিক্ষাক্ষেত্রে শিক্ষার সঙ্গে যুক্ত মানুষদের ক্রমাগত প্রতিস্থাপিত করা হচ্ছে শিক্ষার সঙ্গে সম্পর্কহীন, তোলাবাজ গুণ্ডাদের দ্বারা। স্থানীয় স্তরে স্বতঃস্ফূর্ত প্রতিবাদ ঘটলেও সার্বিকভাবে এই আক্রমণের বিরুদ্ধে কোনো সংগঠিত উদ্যোগ এখনও অনুপস্থিত। এই প্রেক্ষিত মাথায় রেখেই আমরা শিক্ষাক্ষেত্রে এই কালাপাহাড়ি পদক্ষেপের রাজনীতি নিয়ে আলোচনা করব।

শিক্ষাক্ষেত্রে আক্রমণের রাজনীতি

২০০৫-০৬ সালে ভারত গাটস্ (GATT) চুক্তিতে মত দেয় যার ফলে শিক্ষা-স্বাস্থ্য এবং পরিকাঠামো পরিষেবা ক্ষেত্রের অন্তর্ভূক্ত হয়ে পড়ে এবং সেখানে বিশ্ববাণিজ্য সংস্থা এবং শুল্ক ও পণ্যের মূল্য সংক্রান্ত সাধারণ সমঝোতার শর্তাবলী প্রযোজ্য হয়। এক কথায় শিক্ষা-স্বাস্থ্য রাষ্ট্রের কল্যাণকর পরিকাঠামো এখন পণ্য হিসেবে পরিগণিত হবে এবং এই ক্ষেত্রটিকে ক্রমশ পুরোপুরি বেসরকারিকরণ করতে হবে।

বেসরকারি মালিক চায় বিনা পয়সায় সরকারি পরিকাঠামো— শিক্ষা ক্ষেত্রে তা হলো বাড়ি-জমি ও অন্যান্য স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি। তারা কর্মীদের কোন দায় নিতে চায় না, তারা পরিকাঠামো খাতে কোনো ব্যয় করতে চায় না, তারা চায় অনিঃশেষ মুনাফা। আর চায় তাদের এই কাজে রাষ্ট্র-পুলিশ, আইন, আদালত এবং প্রশাসন পূর্ণ সহযোগিতা করুক। বিশ্বায়নের যুগে বাজারের টান এড়িয়ে আইনি পদ্ধতিতে বিশ্বায়ন-বিরোধী অবস্থান নির্বাচনী ইস্তেহারে নেওয়া গেলেও কোনো সরকারের পক্ষেই বাস্তবে বিশ্বায়ন-বিরোধী পদক্ষেপ নেওয়া কার্যত অসম্ভব। বামফ্রন্ট সরকার এই দুই বিপরীতমুখী শক্তির টানা-পোড়েনে শেষ পর্যন্ত গদিচ্যুত হয়েছে তিন দশক পর। তৃণমূল সরকারও সেই স্ববিরোধিতার শিকার হয়েছে।

সরকারি শিক্ষাব্যবস্থার মান্যতা রয়েছে আমাদের সমাজে। তাই সমাজে বেসরকারি শিক্ষা ব্যবস্থার জন্য মান্যতা নির্মাণের জন্য প্রথমেই প্রয়োজন জনসমক্ষে সরকারি ব্যবস্থাকে হেয় প্রতিপন্ন করা, যেখানে যেখানে সরকারি ব্যবস্থার কাঠামো বেসরকারিকরণের পরিপন্থী, সেই সমস্ত কাঠামোর ধ্বংস সাধন। তৃণমূল সরকার ঠিক এটাই শুরু করেছে। এই তাণ্ডবের আড়ালে তারা বেসরকারিকরণের রাস্তা মসৃণ করে তুলছে।

শিক্ষক নিয়োগের জন্য যে চালু এবং মান্য প্রথা রয়েছে, তৃণমূল সরকার ক্ষমতায় এসে প্রথমেই সেখানে আঘাত হেনেছে। পরীক্ষার মাধ্যমে শিক্ষক নিয়োগের যে ধারা এতদিন চলে আসছিল সেখানে পরিবর্তন এনে পশ্চিমবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষা সংসদ আগের সমস্ত নিয়ম উল্টে দিয়ে ২০১৩ সালের মার্চ মাসে ৩৫ হাজার প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগের জন্য 'টেট' পরীক্ষা গ্রহণের সিদ্ধান্ত নেয়। কিন্তু প্রথম থেকেই এই পরীক্ষা ঘিরে অস্বচ্ছতা, দুর্নীতি এবং স্বজনপোষণের অভিযোগ ওঠে। যত দিন যায়, তত দেখা যায় যে অভিযোগগুলি মোটেই ভিত্তিহীন নয়, বরং তাদের সত্যতা দিন কে দিন আরও বেশি করে প্রতিষ্ঠিত হতে থাকে।

প্রথমে বলা হয় যে ৫৫ লক্ষ আবেদনকারী এই পরীক্ষায় বসার জন্য আবেদন করেছেন। এই কথা কর্তৃপক্ষ একটি সাংবাদিক সম্মেলন করে ঘোষণা করেছিলেন। আচমকা তাঁরা আবার ঘোষণা করলেন যে পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ৪৫ লক্ষ। তারপর পরীক্ষা গ্রহণের সময়কার কেলেঙ্কারির কথা পশ্চিমবঙ্গের মানুষ সহসা বিস্মৃত হবেন না। পরীক্ষা দিতে গিয়ে চারজন নিহত হন, প্রচুর পরীক্ষার্থী আহত হন। অনেকেই ঠিক সময়ে পরীক্ষার হলে পৌঁছতে পারেননি যানবাহন বিভ্রাটে। অনেক পরীক্ষা কেন্দ্র শেষ মুহূর্তে বদল করা হয়, যা পরীক্ষার্থীরা জানতে পারেননি। বিভিন্ন পরীক্ষা কেন্দ্রে কম সংখ্যক পরীক্ষার প্রশ্ন এবং ওএমআর সীট পৌঁছেছে। অন্য কেন্দ্র থেকে পরীক্ষার প্রশ্ন, আরও অন্য একটি কেন্দ্র থেকে ওএমআর সীট ফোটো কপি করে এনে অবস্থার সামাল দেওয়া হয়েছে। কোনো কোনো কেন্দ্রে দুঘণ্টা বা তিনঘণ্টা পর পরীক্ষা শুরু হয়েছে— পাড়ার দোকানে প্রশ্নপত্রের ফোটোকপি বিক্রি হয়েছে। গত ২৩ নভেম্বর ২০১৩ সালে এই বিখ্যাত 'টেট' পরীক্ষার ফল প্রকাশিত হল। ফলাফলে দেখা যাচ্ছে

যে, ৩৫ হাজার শূন্য পদের জন্য ১৭ লক্ষ ৭২ হাজার পরীক্ষার্থী পরীক্ষায় বসেছিলেন এবং তাঁদের মধ্যে মাত্র ১৮ হাজার ৭৯২ জন তালিকাভুক্ত হয়েছেন। এরপর ইন্টারভিউ নিয়েও অভিযোগের অন্ত ছিল না। এবং এখনও নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ হয়নি, যদিও পাশের হার মাত্র ০.৪১ শতাংশ। প্রথম দফায় যাঁরা চাকরি পেয়েছেন, তাঁরা হলেন জেলা পিছু ৫০০ জন করে তৃণমূল কর্মী! এই মর্মে একজন তৃণমূল কর্মীর স্ত্রী কলকাতা আদালতে মামলা করলে সেই মামলার সূত্রে চাঞ্চল্যকর সমস্ত তথ্য বেরিয়ে এসেছে। দেখা যাচ্ছে, কালনার তৃণমূল বিধায়ক শ্রী বিশ্বজিৎ কুণ্ডু মহাশয়ের বাড়ির যে আটজন টেট পরীক্ষা দিয়েছিলেন, তাঁদের সবাই চাকরি পেয়েছেন; বীরভূম জেলার দাপুটে তৃণমূল নেতা শ্রী অনুব্রত মহাশয়ের পরিবারের প্রায় সকলেই চাকরি পেয়েছেন, কুলপির বিধায়ক শ্রী যোগরঞ্জন হালদার মহাশয়ের পরিবারের অনেকেই চাকরি পেয়েছেন। এই পরীক্ষা যেভাবে গ্রহণ করা হয়েছে, তাতে তীব্র আপত্তি জানিয়েছে ন্যাশনাল কাউন্সিল অফ টিচার্স অ্যাসোসিয়েশন। তারা আর্থিক বিধিভঙ্গেরও অভিযোগ এনেছে। প্রাক্তন তৃণমূল সাংসদ শ্রী সোমেন মিত্র মহাশয় কেন্দ্রীয় মানব সম্পদ মন্ত্রককে চিঠি লিখে এই কেলেঙ্কারির তদন্ত দাবি করেছেন।

এই ঘটনার প্রেক্ষিতে সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে পরীক্ষায় পাশ করার যে মান, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী শ্রী ব্রাত্য বসু মহাশয় তা কমিয়ে দিয়েছেন। বিদ্যালয় শিক্ষা পর্ষদ আদালতে হলফনামা জমা দিয়ে তা স্বীকারও করেছে। ঘরে-বাইরে সমালোচনার মুখে পড়ে শিক্ষা দপ্তর তড়িঘড়ি দ্বিতীয় 'টেট' পরীক্ষার দিন ঘোষণা করে ২০/০২/২০১৪ এবং ২২/০২/২০১৪-তে। কিন্তু পরীক্ষা শুরুর আগের দিন দেখা যায় বিভিন্ন জেলার তৃণমূল দপ্তরে ছাপা প্রশ্নপত্র পৌঁছে গেছে। নির্দিষ্ট অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত করে ঘটনার সত্যতা প্রমাণিত হলে পরীক্ষা বাতিল বলে ঘোষণা করা হয় এবং পরবর্তী পরীক্ষার দিন ঘোষণা করা হয়। কিন্তু সেই পরিবর্তিত ব্যবস্থা কার্যকর করার জন্য যথেষ্ট দৃঢ় পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি, ফলে পুনরায় অনেকেই পরীক্ষা কেন্দ্র সংক্রান্ত বিভ্রাটে পরীক্ষায় বসতে পারেননি। জানা নেই বর্তমান পরীক্ষাটি নতুন প্রশ্নপত্র, নাকি প্রায় পুরানো প্রশ্নপত্রের আদলেই গ্রহণ করা হয়েছে!

কলেজ শিক্ষকদের নিয়োগের জন্য কলেজ সার্ভিস কমিশন দীর্ঘদিন অকেজো। নিয়োগ সংক্রান্ত পুরো পদ্ধতিটিই ক্রমশ অস্বচ্ছ হয়ে পড়েছে। প্রতিবন্ধী এবং পিছিয়ে পড়া বর্গের প্রার্থীদের জন্য যে প্রয়োজনীয় সংরক্ষণ থাকার কথা, বর্তমান বিজ্ঞাপনে সেই আইনি বাধ্যবাধকতা পালিত হয়নি। ফলে যে কোনো সময়ে নিয়োগে আদালত হস্তক্ষেপ করতে পারে।

পশ্চিমবঙ্গের সমস্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের ৪০ থেকে ৬৫ শতাংশ শিক্ষকের পদ শূন্য। শেষ বড় আকারে নিয়োগ ঘটেছে ২০১১ সালের আগে। বছরের পর বছর বিজ্ঞাপনের পর নিয়োগ হচ্ছে না। কারণ, হয় সরকারি প্রতিনিধি নিয়োগ সংক্রান্ত কমিটিতে নেই, অথবা সরকারি গাফিলতিতে নিয়োগের বোর্ড বসছে না। সম্প্রতি এবিষয়টি সামনে এসেছে বয়স উত্তীর্ণ হওয়া সত্ত্বেও প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান উপাচার্যের কার্যকাল বারবার বাড়ানো নিয়ে।

উচ্চশিক্ষায় সরকার তথা তৃণমূল দলের অবাঞ্ছিত হস্তক্ষেপের ফলে সমগ্র উচ্চশিক্ষা থেকে সিরিয়াস পণ্ডিতরা সরে আসছেন আর তাঁদের স্থান দখল করছে আরাবুল এন্ড কোম্পানি। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পদত্যাগ করার সময় প্রাক্তন উপাচার্য অধ্যাপক সৌভিক ভট্টাচার্য সাংবাদিকদের বলেন যে, তিনি ওপরমহলের চাপ সহ্য করে কাজ চালাতে বাধ্য হচ্ছিলেন এবং নিজের সততার সঙ্গে সমঝোতা করে চলতে অস্বীকার করায় তিনি পদত্যাগ করছেন। এর আগে বর্ধমান এবং বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় উপাচার্যদ্বয় প্রায় একই অভিযোগ এনে পদত্যাগ করেছিলেন। গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের পরপর দুজন উপাচার্য একই কারণে পদত্যাগ করেন। এর মধ্যে অধ্যাপক অচিন্ত্য বিশ্বাস শাসকদলের ঘনিষ্ঠ ছিলেন, কিন্তু তিনি পূর্বে বর্ণিত ইটাহার কলেজের অধ্যাপক নিগ্রহের ঘটনায় তৃণমূল ছাত্র পরিষদের কর্মীদের বহিষ্কার করেন এবং এর ফলে তাঁকে সরে যেতে হয়। প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম উপাচার্য শ্রীমতী অমিতা চট্টোপাধ্যায় অপমানজনক শর্তে তাঁর কার্যকালের মেয়াদবৃদ্ধির প্রতিবাদে পদত্যাগ করেন।

শিক্ষামন্ত্রী স্বয়ং ২৩ নভেম্বর ২০১১ সালে একটি সাংবাদিক সম্মেলন ডেকে পশ্চিমবঙ্গ কারিগরি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক সব্যসাচী সেনগুপ্ত-র বিরুদ্ধে নানান অভিযোগ আনেন। অধ্যাপক সেনগুপ্ত পরে সাংবাদিকদের বলেন যে দুই প্রভাবশালী তৃণমূল মন্ত্রীর সুপারিশ মোতাবেক অকৃতকার্য ছাত্রদের তিনি পাশ করাতে চাননি, তাই তাঁকে সরে যেতে হচ্ছে!

স্কুল সার্ভিস কমিশনের নিয়োগ নিয়ে নাটক পশ্চিমবঙ্গ বাসীরা দেখছেন। তৃণমূল ঘনিষ্ঠ অধ্যাপক চিত্তরঞ্জন মন্ডল তৃণমূল জেলা কমিটির তালিকা মেনে নিয়োগপত্র না পাঠানোর জন্য পদত্যাগ করতে বাধ্য হন। তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন অধ্যাপক প্রদীপ শূর— যিনি কার্যভার গ্রহণ করেই সরকারি টাকায় দামি মোবাইল কেনেন এবং বেআইনিভাবে কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি বিশেষ বিভাগকে অনুমোদনহীন অনুদান দেন! পরে দুর্নীতির অভিযোগে তাঁকেও সরে যেতে হয়।

মাধ্যমিক বোর্ডের প্রেসিডেন্টের পদ থেকে সরিয়ে দেওয়া হয় অধ্যাপক চৈতালী দত্তকে। উচ্চমাধ্যমিক বোর্ড থেকে সরে যেতে হয় অধ্যাপক মুক্তিনাথ চট্টোপাধ্যায়কে। শেষ পর্যন্ত অধ্যাপক সুগত মার্জিত উচ্চশিক্ষা সংসদ থেকে পদত্যাগ করেন। এর

আগে উচ্চশিক্ষা সংসদের পরামর্শদাতা কমিটি থেকে পদত্যাগ করেছেন অধ্যাপক সুকান্ত চৌধুরী, জয়েন্ট এন্ট্রান্স বোর্ড থেকে অধ্যাপক সমীর সাহা। অধ্যাপক সুনন্দ সান্যাল যাবতীয় সরকারি কমিটি থেকে নিজেকে সরিয়ে নিয়েছেন।

সরকার সমস্ত কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্বাচিত পরিচালন সংসদ ভেঙে দিয়েছে অর্ডিনান্স করে এবং সেগুলি পুনর্গঠিত করার জন্য নতুন আইন পাশ করেনি। সর্বত্র তৃণমূলের নেতৃত্বে মনোনীত 'পরিচালন সমিতি' কাজ করছেন। এক একজন জেলার মন্ত্রী জেলার পাঁচ-ছটি কলেজের পরিচালন সমিতির প্রেসিডেন্ট, ফলে মিটিং-এর অভাবে পরিচালন সমিতিগুলি কার্যত অচল।

মুখ্যমন্ত্রী স্বয়ং অকৃতকার্য ছাত্রদের পরীক্ষায় বসতে দেওয়ার ফতোয়া পাঠাচ্ছেন আদালতের নির্দেশ অমান্য করে। পাড়ায় পাড়ায় তৃণমূল কর্মীরা অকৃতকার্য ছাত্রদের পাশ করানোর দাবিতে ১০-১৫ ঘণ্টা শিক্ষকদের ঘেরাও করে রাখছেন। বেআইনি স্কুলগুলিতে অ্যাডমিট কার্ড পাঠাতে নির্দেশ দিচ্ছেন শিক্ষামন্ত্রী। সব মিলিয়ে চলতি শিক্ষা ব্যবস্থাটিকে হাসির খোরাকে পরিণত করার আয়োজন প্রায় সম্পূর্ণ হয়েছে বলা যায়।

এই পরিপ্রেক্ষিতে বর্তমান তৃণমূল সরকার তিনটি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়কে এই রাজ্যে শিক্ষা ব্যবসার জন্য অনুমতি দিয়েছে। তারা ইচ্ছে মতো ফি নেবে, নিজস্ব পরিচালন ব্যবস্থার মাধ্যমে তাদের বিশ্ববিদ্যালয় চালাবে এবং সেখানে ছাত্র-শিক্ষক-শিক্ষাকর্মীদের কোনো গণতান্ত্রিক অধিকার থাকবে না। ইতিমধ্যেই ডাক্তারি শিক্ষায় পিপিপি মডেল নিয়ে পরীক্ষা চলেছে, যেখানে সরকারি পরিকাঠামো বেসরকারি উদ্যোগ বিনা পয়সায় ব্যবহার করবে। ক্যাপিটেশন ফি নিয়ে ছাত্র ভর্তি করলে কী হাল হয় পশ্চিমবঙ্গ কারিগরি বিশ্ববিদ্যালয় তার সাক্ষী। ভাঙচুর, টোকাটুকি, অসাধু উপায়ে ডিগ্রি অর্জন— কিছুই বাকি নেই। পশ্চিমবঙ্গে সমগ্র শিক্ষাব্যবস্থা তাই একটি খাদের ধারে দাঁড়িয়ে— যে কোনোদিন তার মৃত্যু ঘটতে পারে।

৪ নং ফর্ম

পত্রিকা সংক্রান্ত ঘোষণা

কেন্দ্রীয় সংবাদপত্র রেজিস্ট্রেশন (১৯৫৬)
নিয়মাবলীর ৮নং ধারা অনুযায়ী

পত্রিকার নাম ❑ অনীক
প্রকাশের স্থান ❑ প্রযত্নে: পিপল্‌স বুক সোসাইটি
১০/২বি, রমানাথ মজুমদার
কলকাতা ৭০০০০৯
প্রকাশকাল ❑ মাসিক
প্রকাশক, মুদ্রক ও স্বত্বাধিকারী ❑ মীরা চক্রবর্তী
জাতীয়তা ভারতীয়
ঠিকানা শ্যামবিহার, ব্লক ৫, ফ্ল্যাট ১/ডি
রঘুনাথপুর, কলকাতা - ৫৯
সম্পাদক ❑ প্রণব কুমার দে
জাতীয়তা ভারতীয়
ঠিকানা ২৩৮, মানিকতলা মেইন রোড
ফ্ল্যাট নং ১৬, কলকাতা - ৫৪

আমি এতদ্বারা ঘোষণা করছি যে, উপরোক্ত তথ্যগুলি আমার জ্ঞান ও বিশ্বাস মতে সত্য।

স্বাক্ষর : মীরা চক্রবর্তী

অনীক পত্রিকা এবং অন্যান্য বই-এর জন্য

শান্তিনিকেতন-এর

দে'জ পাবলিকেশন

রতনপল্লী, কালো-র দোকানের বিপরীতে

ফোন : ৯৪৩৪১১৬৭১৬

দীপংকর চক্রবর্তী স্মারক বক্তৃতা

বক্তা : আনু মুহম্মদ

স্থান : ভারত সভা হল (সেন্ট্রাল মেট্রো স্টেশনের নিকট)

— বিষয় —

দক্ষিণ এশিয়া : রাষ্ট্রের আধিপত্য জনগণের সংহতি

৪ এপ্রিল, শুক্রবার ২০১৪, বিকেল ৪টা

প্রবন্ধ

ভারতের মহাকাশ গবেষণা—কিছু প্রশ্ন

শুভাশিস মুখোপাধ্যায়

প্রস্তাবনা

পরাধীন ভারতে জ্ঞানচর্চাকে সেকালের বিদ্বৎসমাজ জাতীয়তাবাদী ধারণার অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন। তাঁরা চেয়েছিলেন জ্ঞানচর্চা, বিজ্ঞান গবেষণা এবং সাহিত্যকর্মের মধ্য দিয়ে ভারতকে 'জগৎসভায়' শ্রেষ্ঠ আসন দেবেন। তাই আমরা দেখি, বিজ্ঞান ও কলাবিদ্যায় ভারতীয় বিদ্বজ্জনেরা সর্বোচ্চ আন্তর্জাতিক সম্মান লাভ করেছিলেন পরাধীন ভারতে। এই যোগাযোগটি মোটেই আকস্মিক নয়। সেই সময়কার বিজ্ঞানীরা দেশপ্রেমিক ছিলেন, স্বাধীনতা আন্দোলনে তাঁদের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ অংশগ্রহণ ছিল।

এই অবস্থার একটি গুণগত পরিবর্তন ঘটে গত শতকের চল্লিশের দশক থেকে। প্রত্যক্ষ ইংরাজ রাজত্ব অবসানের ইঙ্গিত যখন পাওয়া গেল, তখন ভারতের এলিট শ্রেণীর যে অংশটি রাজত্ব চালানোর স্বপ্ন দেখতে শুরু করেছিল, তাদের কাছে দেশপ্রেম, বিজ্ঞান-প্রযুক্তিতে আত্মনির্ভরতা ইত্যাদি বিষয়গুলি গৌণ হয়ে ওঠে। তারা চেয়েছিল পূর্বতন 'প্রভুর' সঙ্গে সমঝোতা, সংঘাত নয়। ১৯৪৭-এর পরের সমগ্র নীতিমালা এই সমঝোতার সংকেতবাহী।

এই সমঝোতার চূড়ান্ত বিকৃতরূপ আমরা প্রত্যক্ষ করছি তথাকথিত আধুনিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ক্ষেত্রটিতে। এই ক্ষেত্রটিতে যাবতীয় লগ্নি ঘটছে বিদেশি সহায়তায়, বিদেশের মুখ চেয়ে। দেশীয় গবেষণার স্রোতটিকে রুদ্ধ করে দিয়ে করদাতা জনগণের রক্ত জল করা অর্থ অপচয় হচ্ছে বিজ্ঞানের সামরিকীকরণের মাধ্যমে। এতে লাভের গুড় খাচ্ছে যুদ্ধবাজ ব্যবসায়ী লবি-টি। এই নিবন্ধে আমরা দেখাবো কেমন করে মৌলিক গবেষণার নামে করদাতা জনগণের টাকায় সমরাস্ত্র-গবেষণা হচ্ছে, কীভাবে স্বয়ম্ভরতার পরিবর্তে বিদেশি মুখাপেক্ষিতা বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং শেষ বিচারে কীভাবে জনগণের জন্য কল্যাণকর প্রকল্পগুলির টাকা সরিয়ে অপ্রমাণিত প্রযুক্তিতে লগ্নি হচ্ছে। সামাজিক কল্যাণকর খাতের জন্য বরাদ্দ অর্থ যুদ্ধের খাতে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে।

১৯৪৪ সালে অবিভক্ত ভারতের বোম্বেতে দোরাব্জী টাটা গোষ্ঠীর অর্থানুকূল্যে পরমাণু বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির পত্তন হয়। পরে আসে মহাকাশ গবেষণা এবং এই দুই বিশেষ বিভাগের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট আরও নানান বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় যুদ্ধের প্রয়োজনে যুদ্ধে লিপ্ত দেশগুলিতে রকেট প্রযুক্তি দ্রুত বৃদ্ধি পেতে থাকে। রকেট প্রযুক্তি এবং নিউক্লিয়ার প্রযুক্তির অগ্রগতির পাশাপাশি এই দুই বিষয়ের মধ্যে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ প্রতিষ্ঠিত হয়। এই নিবন্ধে আমাদের দৃষ্টি থাকবে ঠিক কেমনভাবে মহাকাশ বিজ্ঞানের মতো একটি মৌলিক গবেষণার বিষয়ের সমরায়ণ ঘটেছে আমাদের দেশে— ঠিক যেমনটি ঘটেছে অন্যান্য দেশেও। পরমাণু বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ক্ষেত্রে যেমন মৌলিক গবেষণার নামে গড়ে উঠেছে নিয়ন্ত্রণাধীন পরমাণু চুল্লি— তার হাত ধরে এসেছে নিয়ন্ত্রণহীন পরমাণু চুল্লি, অন্য কথায় যাকে বলা হয় পরমাণু বোমা। আজকের বিশ্বে নিয়ন্ত্রিত পরমাণু চুল্লির মালিক প্রতিটি দেশ হয় প্রকাশ্যে নয়তো গোপনে পরমাণু বোমার অধিকারী। ঠিক তেমনি, আজকের দুনিয়ায় যে সমস্ত দেশের মহাকাশ গবেষণা প্রকল্প রয়েছে, ব্যতিক্রমহীনভাবে সেই সমস্ত দেশের হাতে এসেছে ক্ষেপণাস্ত্র; এবং সেই ক্ষেপণাস্ত্র ঐ সমস্ত দেশের যুদ্ধাস্ত্র এবং সমর-সম্ভারের অংশ হয়ে উঠেছে। এটি একটি ঐতিহাসিক তথ্য। এই তথ্যটি আমাদের এই দুই আপাতভাবে ভিন্ন প্রযুক্তির একীকরণটি বুঝতে সাহায্য করবে। আমাদের এই আলোচনার উদ্দেশ্য কোনভাবেই ভারতীয় বিজ্ঞানী ও প্রযুক্তিবিদদের খাটো করা নয়, তাঁদের উদ্ভাবনী শক্তিকে নস্যাৎ করাও নয়, শুধু দেখানো যে সামাজিক প্রেক্ষিতহীন মৌলিক গবেষণাও কীভাবে মুনাফা এবং যুদ্ধবাজদের সেবায় নিয়োজিত হতে পারে।

ভারতের মহাকাশ গবেষণা— গোড়ার কথা

টাটা ব্যবসায়ী গোষ্ঠীর মুনাফার তাড়না চরিতার্থ করার লক্ষ্যে জওহরলাল নেহরুর সস্নেহ প্রশ্রয়ে ১৯৪৪ সালে হোমি জাহাঙ্গীর ভাবা (বোম্বে শহরে) ভারতে পরমাণু গবেষণার ভিত্তি স্থাপন করেন। অন্য একটি সমান্তরাল প্রক্রিয়ায়, ভারত সরকারের অধীনে একটি কেন্দ্রীয় গবেষণাগার গড়ে ওঠে পার্শীদের বাণিজ্যের পীঠস্থান তৎকালীন বোম্বে প্রেসিডেন্সির আমেদাবাদ শহরে। ১৯৪৭ সালে আমেদাবাদে ফিজিক্যাল রিসার্চ ল্যাবরেটরি গড়ে তোলেন বিক্রম সারাভাই, যা কালক্রমে ভারতের 'অসামরিক মহাকাশ গবেষণা'-র কেন্দ্র হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। মনে রাখা দরকার, সারাভাই গোষ্ঠী নানান ব্যবসায়িক স্বার্থে ইংরাজ বণিকদের আর্থিক স্বার্থের সঙ্গে যুক্ত ছিল।

প্রথম থেকেই ভাবা যেমন ব্রিটেনের ফেলে দেওয়া প্রযুক্তি, ফেলে দেওয়া মালমশলা বেশি দামে কিনে নিয়ে তা ব্যবহার করে ব্রিটেনের অনুসারী পরমাণু প্রকল্প গড়ার কাজে আত্মনিয়োগ করেন, সারাভাই ঠিক তেমন রাস্তা নেন নি। সারা পৃথিবীতে ততদিনে মহাকাশ গবেষণা এবং ক্ষেপণাস্ত্র নির্মাণের মধ্যে অন্তরঙ্গ যোগ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে বিজয়ী মার্কিন দেশ, পরাজিত জার্মানির উন্নত মহাকাশ গবেষণা, বিশেষত যুদ্ধের প্রয়োজনে উদ্ভূত চালকহীন ভি-১ এবং ভি-২ রকেট প্রযুক্তি চুরি করে ক্ষেপণাস্ত্র নির্মাণ ও তা পরীক্ষামূলক ক্ষেপণ শুরু

করেছে, এবং তার মাধ্যমে মহাকাশ গবেষণা ও প্রযুক্তির সঙ্গে যুদ্ধ ও অস্ত্র-নির্মাণের আন্তঃসম্পর্ক প্রকাশ্যে প্রতিষ্ঠিত করেছে।

এমনই এক পশ্চাৎভূমির ওপর দাঁড়িয়ে ১৯৫৮ সালের ১লা জানুয়ারি ভারতের প্রতিরক্ষা মন্ত্রক একটি ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। তারা ভারতের প্রতিরক্ষা বিষয়ক যাবতীয় মৌলিক ও ফলিত গবেষণাকে সংহত করার উদ্দেশ্যে ভারতের প্রতিরক্ষা বিজ্ঞান সংগঠন (ডিফেন্স সায়েন্স অর্গাইনাইজেশন)-এর সঙ্গে ভারতীয় সেনাবাহিনীর টেকনিক্যাল ডেভলপমেন্ট এস্টাবলিশমেন্ট এবং ডিরেক্টরেট অফ টেকনিক্যাল ডেভলপমেন্ট অ্যান্ড প্রোডাকশনকে জুড়ে দেয়। (মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে একই ধরনের পদক্ষেপ নেওয়া হয় কমবেশি এক দশক আগে)। এই নতুন বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি গবেষণা কেন্দ্রের নাম দেওয়া হয় 'প্রতিরক্ষা গবেষণা ও বিজ্ঞান সংগঠন' বা 'ডিফেন্স রিসার্চ এ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট অর্গানাইজেশন', সংক্ষেপে *ডিআরডিও*। জন্মলগ্নে এই *ডিআরডিও* প্রকৃত অর্থেই একটি ক্ষুদ্র গবেষণা সংস্থা ছিল— তাদের আওতায় মাত্র ১০টি গবেষণাগারে 'প্রতিরক্ষা ও সমরাস্ত্র বিষয়ক' গবেষণা চলতে থাকে। ভারতীয় সশস্ত্র বাহিনীর মেজর জেনারেল বি ডি কাপুর এই সংগঠনের মুখ্য কনট্রোলার নিযুক্ত হন। প্রথম থেকেই সেনাবাহিনীর প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ মহাকাশ গবেষণার এই বিশেষ ক্ষেত্রটিকে সমরাস্ত্রমুখী করে তুলেছে। সংগঠনটি যখন ভ্রূণাবস্থায়, 'প্রতিরক্ষা বিষয়ক' গবেষণার দিশা যখন সবে নির্দিষ্ট হচ্ছে, ঠিক সেই সময়েই ভারতের সংসদ মন্ত্রীগোষ্ঠীর মারফত *ডিআরডিও*-র মাধ্যমে নিয়ন্ত্রিত ক্ষেপণাস্ত্র সংক্রান্ত গবেষণার জন্য একটি গবেষণাগোষ্ঠী গঠনের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত করেন। এই গবেষণার ফসল যাতে ভারতের সশস্ত্র বাহিনী দ্রুত কাজে লাগাতে পারে, সেদিকে বিশেষ নজর দেওয়ার কথা এই গবেষক গোষ্ঠীকে স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয়। এই প্রকল্পে ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রী জওহরলাল নেহরু-র খুবই উৎসাহ ছিল। প্রতিরক্ষামন্ত্রীর প্রতিরক্ষা বিজ্ঞান সংক্রান্ত পরামর্শদাতা, বিজ্ঞানী ডি এস কোঠারির মারফত তিনি এই বিষয়টি সম্পর্কে খোঁজ খবর রাখতেন।

১৯৫৮ সালের অক্টোবর মাসে দেখা যায়, ক্ষেপণাস্ত্র বিষয়ক গবেষণার অগ্রগতি এতটাই হয়েছে যে তাকে গবেষণাগোষ্ঠীর স্তর থেকে একটি সাংগঠনিক স্তরে উন্নীত করতে না পারলে মৌলিক গবেষণার ফলিত দিকটি রূপায়িত করার কাজটি কঠিন হয়ে পড়বে। ভারতের তৎকালীন প্রতিরক্ষামন্ত্রী ভি কে কৃষ্ণমেনন এবং তাঁর বিজ্ঞান বিষয়ক পরামর্শদাতা অধ্যাপক কোঠারি পুরো ব্যবস্থাটি রাজধানী দিল্লির প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণে আনার পরিকল্পনা করেন। বি এন সিং-এর নেতৃত্বে নয়া দিল্লিতে একটি নিয়ন্ত্রিত ক্ষেপণাস্ত্র গবেষণার গোষ্ঠী গঠিত হয়— তার নাম দেওয়া হয় ডিফেন্স সায়েন্স ল্যাবরেটরি বা *ডিএসএল*। ভারতের প্রতিরক্ষা মন্ত্রক অধ্যাপক ভাবা-র পরমাণু গবেষণা প্রকল্পের মতো এই ক্ষেপণাস্ত্র গবেষণা ক্ষেত্রেও বিপুল পরিমাণ অর্থ জোগান দেয়। সেই সময়কার সংসদের বিতর্ক থেকে জানা যাচ্ছে, ট্যাঙ্ক-প্রতিরোধী ক্ষেপণাস্ত্র-র মতো একটি সমরাস্ত্র নির্মাণ ও তার উন্নতি সাধনের জন্য ভারতের প্রতিরক্ষা মন্ত্রক, *ডিএসএল*-কে প্রথমেই ২ লক্ষ টাকা (১৯৫৮-র মূল্যমানে) অনুদান দিয়েছিলো। ভারতের পরমাণু গবেষণা যেমন শুরু থেকেই 'গোপন কর্মসূচী'-র আওতায়, ঠিক তেমনি এবার থেকে 'গোপনীয়তার প্রয়োজনে' এই ক্ষেপণাস্ত্র গবেষক গোষ্ঠীর একটি নিরামিষ সাংকেতিক নাম দেওয়া হয়, 'স্পেশাল ওয়েপন ডেভলপমেন্ট টিম' বা *এসডব্লুডিটি*।

সমরাস্ত্র সংক্রান্ত মৌলিক গবেষণাকে ফলিত রূপ দিতে গিয়ে বোঝা গেল, সব কাজ প্রকাশ্যে করতে গেলে ভারত সরকারকে অনেক আন্তর্জাতিক বিধি-নিষেধ মেনে চলতে হবে। অন্যদিকে 'মহাকাশ গবেষণা'-র নামে এমন অনেক গবেষণার কাজ করা সম্ভব, যা আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বিধিনিষেধ জনিত সমস্যার সম্মুখীন হবে না। ভারত সরকার তখন সিদ্ধান্ত নেয় যে গবেষণার একেবারে গোপন অংশটি কিছুতেই প্রকাশ্যে আনা হবে না এবং যে সমস্ত গবেষণার একটি নিরামিষ মৌলিক ভিত্তি রয়েছে, সেগুলি প্রকাশ্যে চালানো হবে। শুধু খেয়াল রাখা হবে যে প্রকাশ্যে গবেষণার বিষয়গুলির যেন দ্বৈত চরিত্র থাকে— অর্থাৎ সেই গবেষণার ফলকে সহজেই ক্ষেপণাস্ত্র নির্মাণের প্রযুক্তিতে রূপান্তরিত করা সম্ভব হবে।

নিয়ন্ত্রিত পরমাণু চুল্লি এবং নিয়ন্ত্রিত ক্ষেপণাস্ত্র— এই দুই ক্ষেত্রের গবেষণার জন্য কিছু কিছু সমভাবাপন্ন প্রযুক্তির বিকাশের প্রয়োজন ছিল। অন্যদিকে, মহাকাশ-বিজ্ঞান সংক্রান্ত কিছু কিছু মৌলিক গবেষণার ফলিত রূপ আবার নিয়ন্ত্রিত পরমাণু চুল্লি এবং নিয়ন্ত্রিত ক্ষেপণাস্ত্র গবেষণার জন্য একইভাবে প্রযোজ্য। অর্থাৎ এই জাতীয় গবেষণাগুলি আসলে দ্বৈত চরিত্র বিশিষ্ট। এগুলি নিয়ে প্রকাশ্য মৌলিক গবেষণা শেষ বিচারে পারমাণবিক এবং ক্ষেপণাস্ত্র সংক্রান্ত গোপন গবেষণার অনুপূরক হিসেবেই কাজ করবে।

এই প্রেক্ষিতটি মাথায় রেখে ভারত সরকার ১৯৬১ সালে মহাকাশ গবেষণা এবং 'শান্তির উদ্দেশ্যে' মহাকাশ অভিযানের বিষয়টি ভারতের পরমাণু মন্ত্রকের নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসে। একই সঙ্গে বিক্রম সারাভাই প্রতিষ্ঠিত আমেদাবাদের ফিজিক্যাল রিসার্চ লেবরেটরি বা *পিআরএল*-কে ভারতের পরমাণু বিভাগের নিয়ন্ত্রণে একটি স্বশাসিত গবেষণা সংস্থা হিসাবে ঘোষণা করা হয়। ১৯৬১ সাল থেকে ১৯৭২ সাল পর্যন্ত এই পিআরএল-এর মাধ্যমেই ভারত সরকার তার মহাকাশ গবেষণা সংক্রান্ত যাবতীয় ক্রিয়াকলাপ কেন্দ্রীভূত করে। এমনকি এই গবেষণার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ করা হয় পিআরএল-কে, যাতে দেশের মানুষ এবং আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলি বুঝতে না পারে যে ভারত সরকার মহাকাশ গবেষণার কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে কত টাকা ব্যয় করে ঠিক কী কী ধরনের গবেষণা করছে।

ভারতের মহাকাশ গবেষণা : এগিয়ে চলা

ভারতের মহাকাশ গবেষণার বিষয়টি পরমাণু বিভাগের বা *ডিএই*-র হাতে যাওয়ার পর, *ডিএই* বিক্রম সারাভাইকে চেয়ারম্যান নিযুক্ত করে ভারতের মহাকাশ প্রকল্প দেখাশোনা করার জন্য একটি ন্যাশনাল কমিটি অন স্পেস রিসার্চ গঠন করে। সময়টা ছিল ১৯৬২ সাল, যখন ভারত-চীন সীমান্ত যুদ্ধ আসন্ন এবং যে সীমান্ত যুদ্ধে ভারতীয় সৈন্যবাহিনীর অপ্রস্তুত এবং অপেশাদারী অবস্থা প্রমাণিত হবে। ফলে সেনাবাহিনীর পক্ষ থেকেও ভারতীয় সেনাবাহিনীকে আরও 'উন্নত ও আধুনিক' করার চাপ ছিল, বিশেষত প্রতিবেশী দেশ চীন যখন উন্নত সেনাবাহিনীর ক্ষমতা প্রদর্শন করে দেখিয়েছে যে প্রতিরক্ষার ক্ষেত্রে সমরাস্ত্র সংক্রান্ত গবেষণার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। ফলে ভারতের ক্ষেপণাস্ত্র নির্মাণ প্রকল্পটির অগ্রাধিকার অনেকটাই বেড়ে যায়। কিন্তু ক্ষেপণাস্ত্র চাইলেই তা নির্মাণ করা সম্ভব নয়। তার জন্য প্রয়োজন অনেক ধরনের মৌলিক গবেষণা, রকেট বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উন্নতি। প্রধানত রকেট বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির একটি স্তরের উন্নতি ব্যতিরেকে নিয়ন্ত্রিত ক্ষেপণাস্ত্র নির্মাণ কার্যত অসম্ভব।

আন্তর্জাতিক স্তরের একটি বিশেষ পদক্ষেপ ভারতের এই দ্বৈত-চরিত্রের প্রযুক্তি সংক্রান্ত গবেষণার ক্ষেত্রে বিশেষ সুযোগ এনে দেয়। শান্তিপূর্ণ উদ্দেশ্যে মহাকাশ গবেষণা সংক্রান্ত রাষ্ট্রপুঞ্জের একটি ঘোষণায় পৃথিবীর নিরক্ষীয় অঞ্চলে এবং দক্ষিণ গোলার্ধে একটি বিশেষ ধরনের রকেট নির্মাণের ক্ষেত্রে সুবিধাদানের কথা বলা হয়। এই ঘোষণার সুযোগ নিয়ে, রাষ্ট্রপুঞ্জের সহায়তায় ভারত নিরক্ষীয় অঞ্চলের বিদ্যুৎপ্রবাহ পরিমাপের জন্য রকেট প্রকল্প গড়ে তোলার পরিকাঠামো গড়ে তোলে। এই জাতীয় রকেটকে পরিভাষায় বলা হল 'সাউন্ডিং রকেট'। শব্দটি নৌবাহিনী থেকে ধার করা। নৌ-বাহিনী তাদের পরিমাপ সংক্রান্ত কার্যকলাপকে ধোঁয়াশার মধ্যে রাখার অভিপ্রায়ে এই পদ্ধতির নাম দিয়েছে 'সাউন্ডিং'। তাই মহাকাশ বিজ্ঞানে পরিমাপের জন্য রকেটকে 'সাউন্ডিং রকেট' বলা হয়।

ভারতের ন্যাশনাল কমিটি অন স্পেস রিসার্চ মার্কিন দেশের 'নাসা'র সহায়তায় (এই 'নাসা' সংস্থার কাছেই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় জার্মানির কাছ থেকে রাজেয়াপ্ত করা অতি উন্নত রকেট ও ক্ষপণাস্ত্র প্রযুক্তি ছিল) যন্ত্রাংশ থেকে জুড়ে সাউন্ডিং রকেট গড়ে তোলা এবং ক্ষেপণকেন্দ্র স্থাপনের জন্য চুক্তিবদ্ধ হয়। ভারতের বিজ্ঞানীদের মার্কিন দেশ এবং ফ্রান্সে পাঠিয়ে এই বিষয়ে বিশেষ প্রশিক্ষণেরও ব্যবস্থা চূড়ান্ত করা হয়। এছাড়াও ভারত ফ্রান্স থেকে রাডার এবং সাউন্ডিং রকেট এবং তার যন্ত্রাংশ আমদানির বিষয়ে চুক্তি করে। ততদিনে ফ্রান্স ভারতকে পরমাণু চুল্লির জ্বালানি দেবে বলেও চুক্তি করে। এই দুই চুক্তির মাধ্যমে ভারত মহাকাশ গবেষণা এবং পরমাণু গবেষণাকে একই ছাতার তলায় এনে দ্বৈত-চরিত্র সম্পন্ন প্রযুক্তি নির্মাণের গোড়াপত্তন করে।

এই সাউন্ডিং রকেটকে এই কারণে দ্বৈত-চরিত্রের প্রযুক্তির পরীক্ষাকেন্দ্র বলা হয় যে এই রকেটের পরীক্ষামূলক উৎক্ষেপণের মাধ্যমে যেমন অপেক্ষাকৃত কম খরচায় কৃত্রিম উপগ্রহ এবং মহাকাশযানের জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতির (যেমন মোটর, নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা, জ্বালানী ইত্যাদি) দক্ষতা, রূপায়ণযোগ্যতা এবং নির্ভরযোগ্যতার পরীক্ষা করা যায়, তেমনি এই সমস্ত বস্তু দিয়েই যেহেতু ক্ষেপণাস্ত্রও নির্মিত হয়, তাই ক্ষেপণাস্ত্র প্রযুক্তিকে রূপায়ণযোগ্য করে তোলার কাজটিও প্রকাশ্যে সেরে ফেলা যায়!

এই সময় নাগাদ ভারত সুইজারল্যান্ডের সঙ্গে মধ্যম পাল্লার ভূমি থেকে আকাশে ক্ষেপণ-যোগ্য নিয়ন্ত্রিত ক্ষেপণাস্ত্র কেনার জন্য চুক্তিবদ্ধ হয়— এই প্রকল্পের সাংকেতিক নাম দেওয়া হয় 'প্রজেক্ট ইন্ডিগো'। ভারতীয় সৈন্যবাহিনী ভেবেছিল, এমন একটি ক্ষেপণাস্ত্রের অংশগুলি খুলে ফেলে তাদের নির্মাণ-কৌশল আয়ত্ত করা যাবে এবং কেমনভাবে যন্ত্রাংশগুলি পরপর জুড়ে একটি সম্পূর্ণ ক্ষেপণাস্ত্র নির্মিত হয়েছে সে বিষয়ে সম্যক জ্ঞান লাভ করা সম্ভব হবে। এই প্রক্রিয়াকে বলা হয় 'রিভার্স ইঞ্জিনিয়ারিং'। কিন্তু দেখা গেল, সুইজারল্যান্ড থেকে এই ক্ষেপণাস্ত্র প্রকৌশল এবং পদ্ধতির দিক থেকে এতটাই জটিল এবং সূক্ষ্ম যে রিভার্স ইঞ্জিনিয়ারিং পদ্ধতিতে তার কৃৎ-কৌশল আয়ত্ত করতে প্রায় এক দশক লেগে যাবে। তাই সিদ্ধান্ত হয় যে রিভার্স ইঞ্জিনিয়ারিং-এর জন্য অপেক্ষাকৃত কম জটিল রাশিয়ান এমএ-২ প্রজন্মের সমতুল্য ক্ষেপণাস্ত্র কেনা হবে! ফলে 'প্রজেক্ট ইন্ডিগো' পরিত্যক্ত হয়।

এই উদ্দেশ্যে ভাবা স্বয়ং নেহরুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে নেহরুকে ভারতের পরমাণু প্রকল্প এবং মহাকাশ ও ক্ষেপণাস্ত্র প্রকল্পের আন্তঃসম্পর্কের বিষয়ে অবহিত করে মসৃণ ও নিরবচ্ছিন্ন অর্থলগ্নির বিষয়ে নিশ্চয়তা আদায় করেন। এরপর ভারত দুটি সমান্তরাল পদ্ধতিতে সাউন্ডিং রকেট প্রকল্প হাতে নেয়। একদিকে ভারতে লাইসেন্স-এর ভিত্তিতে ফ্রান্সের দ্বি-স্তর প্রযুক্তির সেন্টাউর রকেট নির্মাণের ব্যবস্থা করা হয়। অন্যদিকে ভারত তার নিজস্ব সাউন্ডিং রকেট নির্মাণের উদ্যোগ নেয়। এই বিষয়ে প্রথমে নির্দিষ্ট গবেষণার জন্য বেছে নেওয়া হয় কঠিন-পদার্থ ভিত্তিক জ্বালানির গবেষণা এবং ৫০ মিমি ব্যাসযুক্ত মোটর-এর নির্ভরযোগ্যতার গবেষণা। ভারত শেষ পর্যন্ত দেশীয় প্রযুক্তিতে ৫০ মিমি ব্যাসের রোহিনী-০০ প্রজন্মের মোটর বানাতে সক্ষম হয়। এই দুই ক্ষেত্রের গবেষণার ফলে ভারত রোহিনী প্রজন্মের সাউন্ডিং রকেট বানানোর দিকে দৃঢ় পদক্ষেপে এগিয়ে চলে।

একই চুক্তির ফলে সোভিয়েত রাশিয়ার মধ্যম পাল্লার ভূমি-থেকে-আকাশে ক্ষেপণযোগ্য ক্ষেপণাস্ত্র ভারতে এসে পৌঁছোয় এবং তা অতি দ্রুত ভারতীয় সেনাবাহিনীর আধুনিকীকরণ প্রক্রিয়ার অংশ হয়ে পড়ে। এই ক্ষেপণাস্ত্র কেবল ১৩০ কেজি কিগ্রা সাবেকি উচ্চ-ক্ষমতাসম্পন্ন বিস্ফোরক বহনে সক্ষম ছিল।

নভেম্বর ২০, ১৯৬৭ ভারত তার প্রথম সাউন্ডিং রকেট, রোহিনী-৭৫ ক্ষেপণ করতে সক্ষম হয়। এই রকেট উৎক্ষেপণের

মাধ্যমে ভারতের বিজ্ঞানীরা এই প্রথমবারের জন্য বাস্তব ক্ষেত্রে রকেটের নক্সা, কার্যকারিতা, রকেটে কঠিন জ্বালানি ভরা এবং বাস্তবে উড়ন্ত বস্তুকে পৃথিবী থেকে দূরপাল্লার প্রযুক্তির সাহায্যে নিয়ন্ত্রণের কৌশল আয়ত্ত করার প্রয়াস পান।

১৯৬৯ সালের ফেব্রুয়ারিতে ভারতের পরমাণু মন্ত্রক অন্ধ্রপ্রদেশের শ্রীহরিকোটাতে দ্বিতীয় রকেট উৎক্ষেপণ কেন্দ্র গড়ার সিদ্ধান্ত নেয়। পাশাপাশি তারা দূরসঞ্চার পদ্ধতিতে তথ্য আদান-প্রদান এবং তথ্যভিত্তিক নিয়ন্ত্রণের গবেষণা চালু করে। ১৯৭১ সালে দ্বি-স্তর রোহিনীর পরিবর্তে ত্রি-স্তর রোহিনী উৎক্ষেপণের লক্ষ্যমাত্রা ধার্য হয়। এর জন্য অর্থবরাদ্দের পরিমাণ ধরা হয় ২ কোটি ৭০ লক্ষ টাকা (১৯৬৫ সালের মূল্যমানে) এবং সঞ্চার ব্যবস্থা সংক্রান্ত গবেষণার জন্য আরও ৩ কোটি ৭৫ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হয়।

১৯৬৯ সালে ভারতের স্বাধীনতা প্রাপ্তির ২২ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে ১৫ই আগস্ট ভারতের পরমাণু বিভাগ ভারতীয় মহাকাশ গবেষণা সংস্থা বা ইন্ডিয়ান স্পেস রিসার্চ অরগানাইজেশন বা সংক্ষেপে *ইস্‌রো* গঠন করেন। এই সংগঠনটি ভারতের মহাকাশ গবেষণার সর্বোচ্চ সংগঠন হিসেবে গড়ে তোলা হয়। জার্মানির সহযোগিতায় কৃত্রিম উপগ্রহ উৎক্ষেপণের জন্য পরীক্ষামূলক উৎক্ষেপণ কেন্দ্র গড়ার কাজ শুরু হয়। দূরপাল্লার উৎক্ষেপণের মূল পরিকাঠামো গড়ে ওঠার পর তৎকালীন প্রধানমন্ত্রীর প্রত্যক্ষ নির্দেশে দূরপাল্লার ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র নির্মাণের এক গোপন প্রকল্প হাতে নেওয়া হয়। ১৯৭০ সালের নভেম্বর নাগাদ ঠিক হয় যে আগামী চার বছরের মধ্যেই ৫০০ কেজি বিস্ফোরক বহন-ক্ষম এবং ৪০০০ কিমি পাল্লার দূর-লক্ষ্যভেদে সক্ষম ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র গড়ে তোলা হবে। ১৯৭১ সালে এই প্রকল্পের জন্য প্রয়োজনীয় কঠিন-পদার্থ-জাত জ্বালানি প্রস্তুত করার জন্য আট লক্ষ টাকা ব্যয়ে শ্রীহরিকোটায় একটি রকেট জ্বালানি কারখানা গড়ে তোলা হয়।

মহাকাশ গবেষণা ও ক্ষেপণাস্ত্র

দ্বৈত-চরিত্রের ফলিত গবেষণা যখন একটা স্তর পর্যন্ত অগ্রসর হয়, তখন সেই গবেষণালব্ধ ফলকে সংহত করার প্রয়োজন দেখা যায়। ১৯৭২ সালে ভারত সরকার আমেদাবাদের *পিআরএল*-এর মাধ্যমে মহাকাশ গবেষণা সংক্রান্ত অর্থ ও নিয়ন্ত্রণ-এর বিষয়টির পরিবর্তে মহাকাশ গবেষণা সংক্রান্ত সম্পূর্ণ একটি বিভাগ তৈরি করে তার ওপর যাবতীয় দায়িত্ব ন্যস্ত করে।

এই প্রকল্পটি জ্ঞান-ভিত্তিক হওয়াতে প্রথমেই প্রয়োজন পড়ে সুশিক্ষিত মানব-সম্পদের। এক্ষেত্রে ভারত সরকার মার্কিন দেশের আদলে যেমনভাবে পরমাণু গবেষণা কেন্দ্র গড়ে তুলেছিলো, মূলত সেই আদর্শটিই অনুসরণ করে। ডিফেন্স রিসার্চ এ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট ল্যাবরেটরি আগ্রাসী পদ্ধতি অনুসরণ করে সারা দেশের বিশ্ববিদ্যালয় এবং গবেষণা সংস্থা থেকে বিজ্ঞানী ও প্রযুক্তিবিদদের চাকরি দেওয়া শুরু করে। যখন এই কর্মসংস্থান প্রকল্প হাতে নেওয়া হয়, তখন এই সংস্থায় বিজ্ঞানী ও প্রযুক্তিবিদের সংখ্যা ছিলো কম-বেশি ৪০০। আর উদ্যোগ গ্রহণের মধ্যপর্বে ১৯৭৪ সালের মাঝামাঝি সংখ্যাটি বেড়ে দাঁড়ায় প্রায় ২৫০০ জন।

পার্শী বণিক টাটার আনুকূল্যে যেমন বোম্বাই-এর টাটা ইনস্টিটিউট অফ ফান্ডামেন্টাল রিসার্চ মৌলিক গবেষণার নামে, নিউক্লিয়ার শক্তি উৎপাদনের লক্ষ্য প্রকাশ্যে রেখে নিউক্লিয়ার বোমা বানানোর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি গড়ে তোলে, ঠিক তেমনি ব্যাঙ্গালোর (অধুনা ব্যাঙ্গালুরু) শহরের টাটা সংস্থার অন্য একটি গবেষণাগার, ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ সায়েন্সকে মহাকাশ গবেষণার এই প্রকল্পের জন্য ভরকেন্দ্র হিসেবে নির্বাচিত করা হয়। এই সংস্থার এরোনটিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং এবং বিভিন্ন বিজ্ঞান বিভাগকে মহাকাশ প্রকল্পের বিভিন্ন অংশের গবেষণার জন্য নির্দিষ্ট করা হয়।

বিজ্ঞানী ভাবা যেভাবে পরমাণু গবেষণার যাবতীয় বিষয় (গবেষণা, প্রযুক্তি, পঠন-পাঠন, প্রশিক্ষণ, পরমাণু সংক্রান্ত খনিজ সহ অন্যান্য বস্তু) ভয়ানক কেন্দ্রীভূত করে সামরিক সুরক্ষায় আওতায় নিয়ে আসেন, প্রায় সেই আদলেই অধ্যাপক সতীশ ধাওয়ান ভারতের মহাকাশ গবেষণার যাবতীয় বিষয় কেন্দ্রীভূত করে তোলেন। এই লক্ষ্যে তিনি তিরুবনন্তপুরম-এর স্পেস সাইন্স এ্যান্ড টেকনোলজি সেন্টার, কেরালার থুম্বা-র রকেট প্রপালসান প্ল্যান্ট, রকেট ফেব্রিকেশন ফেসিলিটি এবং অন্ধ্রের শ্রীহরিকোটার হাই অলটিটিউড রেঞ্জকে একীভূত করে, তিরুবনন্তপুরমকে মুখ্য সদর ক'রে বিক্রম সারাভাই স্পেস সেন্টার বা সংক্ষেপে *ভিএসএসসি* গঠন করেন। আবার কৃত্রিম উপগ্রহ উৎক্ষেপন সংক্রান্ত যাবতীয় ভারতীয় সংস্থাগুলিকে একীভূত করে আহমেদাবাদ ভিত্তিক স্যাটেলাইট এপ্লিকেশন সেন্টার গঠন করেন। এই দুটি সংস্থার যুগ্ম প্রচেষ্টায় ভ্যালিয়েন্ট ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র (সাংকেতিক নাম) নির্মাণের গোপন প্রকল্প হাতে নেওয়া হয়।

কিন্তু ভারতের নিজস্ব প্রযুক্তি যথেষ্ট পরিমাণে উন্নত না হওয়ায় নিরামিষ মহাকাশ গবেষণার বিষয়টি দেখিয়ে ভারত সরকার ক্ষেপণাস্ত্র সংক্রান্ত বেশ কিছু মোটর এবং স্বয়ংক্রিয় নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা আমদানি করে। এসব যে দ্বৈত-চরিত্রের প্রযুক্তি সেটা বোঝা যায় যখন আমরা দেখি যে ভারত সরকার তাদের আমদানি করা এই সমস্ত যন্ত্রাংশ তাদের বোমারু বিমানে সংলগ্ন করে এইসব যন্ত্রাংশের কার্যকারিতার পরীক্ষায় লিপ্ত হয়।

ইতিমধ্যে সোভিয়েত রাশিয়া থেকে আমদানি করা মধ্যম পাল্লার ক্ষেপণাস্ত্র-র রিভার্স ইঞ্জিনিয়ারিং-এর প্রকল্পটি হাতে নেওয়া হয়। এই কাজটির জন্য অর্থ বরাদ্দ লাফিয়ে লাফিয়ে বেড়ে হয় ১৬ কোটি টাকা, যার মধ্যে ৫ কোটি টাকা আমদানি করতেই লেগে যায়। এর মাধ্যমে ভারত ক্ষেপণাস্ত্র প্রযুক্তির নানা দিক সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান লাভ করে।

এতো কিছু করেও ক্ষেপণাস্ত্র নির্মাণের গোপন প্রকল্পটি ভারতীয় সেনাবাহিনীর কাছে কখনই গ্রহণযোগ্য হয়ে ওঠেনি। রিভার্স ইঞ্জিনিয়ারিং থেকে প্রাপ্ত ক্ষেপণাস্ত্রগুলি ভারতীয় সেনাবাহিনী ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধে (১৯৭১) পূর্ব পাকিস্তানে (অধুনা বাংলাদেশ) ব্যবহার করে। যে ১১টি ক্ষেপণাস্ত্র ব্যবহৃত হয়েছিল তার কোনোটাই লক্ষ্যবস্তুর কাছাকাছিও পৌঁছায়নি। পরীক্ষামূলক ক্ষেপণেও দেখা যায় যে ক্ষেপণাস্ত্রগুলি লক্ষ্যবস্তুকে আঘাত করতে ব্যর্থ হয়েছে। সেনাবাহিনী তাই ভারতের ক্ষেপণাস্ত্র প্রকল্প বন্ধ করে দিয়ে সরাসরি আন্তর্জাতিক বাজার থেকে ক্ষেপণাস্ত্র কেনার সুপারিশ করে।

ক্ষেপণাস্ত্র কথা : দ্বৈত প্রযুক্তির ছদ্মবেশ

ক্ষেপণাস্ত্র নির্মাণ নিয়ে ভারতের সেনাবাহিনীর মতো প্রতিরক্ষা মন্ত্রকও প্রায় একই সিদ্ধান্তে আসতে থাকে। ঠিক হয়, ভারত যেমন ব্রিটেনের কাছ থেকে 'ফেলে দেওয়া' প্রযুক্তি আমদানি করে অন্তত পোখরান পরমাণু বোমা বিস্ফোরণে পৌঁছেছিলো, তেমনি ক্ষেপণাস্ত্র উৎপাদনের জন্যও বিদেশের বাতিল প্রযুক্তি-র সাহায্য নিতে হবে।

আমলা-বিজ্ঞানীরা এবং যে সমস্ত বিদেশি সংস্থাগুলি এই সব আমলা-বিজ্ঞানীদের প্রশিক্ষিত করে ভারতে তাদের ব্যবসায়িক স্বার্থ দেখার 'বিশেষজ্ঞ'-র তক্‌মা দিয়ে পাঠিয়েছিল, তারা তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর ওপর চাপ সৃষ্টি করতে থাকে। রাজনৈতিক নির্বাসন থেকে সদ্য পুনঃপ্রতিষ্ঠা পাওয়া শ্রীমতী গান্ধীর কাছে 'গরিবি হটাও'-এর পরবর্তী শ্লোগান হিসেবে 'বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে স্বনির্ভরতা অর্জন' একটি ঝকমকে স্লোগান হিসেবে হাজির হয়। এই চমকপ্রদ স্লোগানটি জনপ্রিয় করার অভিপ্রায়ে ইন্দিরা গান্ধী তথাকথিত 'আধুনিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ক্ষেত্র' (যেমন নিউক্লিয়ার বিজ্ঞান এবং মহাকাশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি) বেছে নেন। পোখরানের পরমাণু বোমা বিস্ফোরণের ফল হিসেবে পরমাণু গবেষণা ও প্রযুক্তিগত আমদানির ক্ষেত্রে ভারতের বিরুদ্ধে নানা রকম নিষেধাজ্ঞা জারি হয় এবং এই ক্ষেত্রটি সহ সংশ্লিষ্ট নানান ক্ষেত্রে কিছুটা হলেও স্বনির্ভর বিজ্ঞান-প্রযুক্তি উদ্ভাবনের প্রয়োজনীয়তা সৃষ্টি হয়।

শ্রীমতী গান্ধী এ পি জে আবদুল কালামের নেতৃত্বে (শ্রীমতী গান্ধী তাঁকে ইস্‌রো-র একটি প্রয়োজনীয় বিভাগের প্রধান হিসেবে উন্নীত করেন) কৃত্রিম উপগ্রহ উৎক্ষেপণ প্রকল্পের সূচনা ঘোষণা করেন। শুনতে বিষয়টি অসামরিক ও পরিষেবামূলক মনে হলেও আদতে এটি ছিলো দ্বৈত-চরিত্রের। কালাম এক সময় নিজেই বিষয়টি ফাঁস করে দিয়ে বলেন যে এই অসামরিক কৃত্রিম উপগ্রহ উৎক্ষেপণ প্রকল্পটি আসলে ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র সংক্রান্ত গবেষণা। বস্তুত, ভারতের প্রথম প্রজন্মের *অগ্নি* ক্ষেপণাস্ত্র প্রকল্পটি এই গবেষণারই ফল।

সতীশ ধাওয়ানও *ওয়াশিংটন পোস্ট* পত্রিকার সাংবাদিককে দেওয়া একটি সাক্ষাৎকারে বলেন, ''যে কোনও দেশ, যারাই মহাশূন্যের নির্দিষ্ট একটি কক্ষে কৃত্রিম উপগ্রহ স্থাপন করতে পারে, তারাই আন্তঃমহাদেশীয় ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাত্র নির্মাণ এবং উৎপেক্ষণ করতে পারে। ভারতও কৃত্রিম উপগ্রহ উৎক্ষেপণ সংক্রান্ত গবেষণার মাধ্যমে এখন আন্তঃমহাদেশীয় ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাত্র উৎপাদনের জন্য অনেক দূর এগিয়ে গেলো।'' (*ওয়াশিংটন পোস্ট*, ১৮ জুলাই, ১৯৮০)।

এই বিবৃতি নিয়ে আন্তর্জাতিক স্তরে হইচই পড়ে গেলে শ্রীমতী গান্ধী প্রথমে ভারতীয় সেনাবাহিনীর তিন প্রধানকে একটি উচ্চপর্যায়ের বৈঠকে আশ্বস্ত করেন যে কূটনীতির খাতিরে সরকার বিবৃতিতে যাই বলুক না কেন, ক্ষেপণাস্ত্র তৈরির এই প্রকল্প আরও দ্রুততার সঙ্গে রূপায়ণ করা হবে। তার পরেই, ২৫শে জুলাই ১৯৮০, শ্রীমতী গান্ধী দিল্লিতে একটি সরকারি সাংবাদিক সম্মেলন করে বলেন যে ভারতের মহাকাশ গবেষণা কেবল মৌলিক গবেষণাতেই সীমাবদ্ধ। ভারতের মহাকাশ গবেষণা প্রকল্পকে সামনে রেখে ভারত ক্ষেপণাত্র গবেষণা চালাচ্ছে বলে যে অভিযোগ উঠেছে তা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন।

ভাবা পরমাণু গবেষণা কেন্দ্র মতোই ভারতের মহাকাশ গবেষণা কেন্দ্রগুলিও নিজেদের সংহত করার পর এই সংক্রান্ত গবেষণা, উৎপাদক ও উদ্ভাবন কুক্ষিগত করার উদ্দেশ্যে একের পর এক সংস্থাকে অধিগ্রহণ করে সেগুলিকে সামরিক গোপনীয়তার আওতায় নিয়ে আসে। চণ্ডীগড়ের সেমিকন্ডাকটর কমপ্লেক্স লিমিটেডকে কার্যত অধিগ্রহণ করে ভারত সরকার এই সংস্থার মাধ্যমে মার্কিন প্রযুক্তিতে অতি বৃহৎ অর্ধপরিবাহী-ভিত্তিক ইন্টিগ্রেটেড সার্কিট প্রস্তুত করার উদ্যোগ নেয়। প্রসঙ্গত বলা যায়, এই পদক্ষেপটিও দ্বৈত-প্রযুক্তি আহরণের একটি প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ। পরবর্তীকালে ভারতের যাবতীয় ক্ষেপণাস্ত্র এই উৎপাদনের সুবিধা গ্রহণ করেছে। ভারতের নিউক্লিয়ার যুদ্ধাস্ত্র গবেষণা এবং ক্ষেপণাস্ত্র গবেষণার মধ্যে যোগসূত্র এবং সমন্বয় সাধনের জন্য ১৯৭৪-এর পোখরান-১ বিস্ফোরণের অন্যতম নেপথ্য নায়ক পরমাণু শক্তি কমিশনের তৎকালীন চেয়ারম্যান অধ্যাপক রাজা রমান্না, *ডিআরডিও*-র তৎকালীন চেয়ারম্যান আবদুল কালামকে নিয়ে একটি কমিটি গঠন করে ভারতের ক্ষেপণাস্ত্র গবেষণার গতিকে পুনরুজ্জীবিত করার দায়িত্ব দেন।

১৯৮১ সালে অধ্যাপক সতীশ ধাওয়ান *ওয়াশিংটন পোস্ট*-এর একটি সাক্ষাৎকারে পুনরায় বলেন যে ''...রকেট প্রযুক্তি দু-দিকে ধারওয়ালা ছুরির মতো। এটা দিয়ে হত্যাও করা যায় আবার সব্জিও কাটা যায়। ছুরির মতো রকেটও জানে না তাকে কী উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হবে। যে ব্যবহার করবে সেই ঠিক করবে সে এটিকে ক্ষেপণাস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করবে কিনা।'' (*ওয়াশিংটন পোস্ট*, সি-৪, ডিসেম্বর-৪, ১৯৮১)।

রামান্না দ্বারা দায়িত্বপ্রাপ্ত হয়ে আবদুল কালাম (আবদুল কালাম তাঁর আত্মজীবনীমূলক পুস্তক *অগ্নিপক্ষ*-এ বিস্তারিত বিবরণ দিয়ে 'শান্তির উদ্দেশ্যে মহাকাশ গবেষণা' সংক্রান্ত

মিথ্যার ফানুস নিজেই ফাটিয়ে দিয়েছেন) সেনাবাহিনীর তিন প্রধানের সঙ্গে বৈঠকে মিলিত হয়ে তাঁদের চাহিদা কী সেটি সরাসরি জেনে নিয়ে ভারতের মহাকাশ গবেষণার মাধ্যমে নানান ধরনের ক্ষেপণাস্ত্র গবেষণার কাজ প্রকাশ্যে শুরু করে দেন। এর ফলে সেনাবাহিনীর মধ্যে এই সমস্ত 'বোমারু-বিজ্ঞানী-প্রযুক্তিবিদ-আমলা'-দের গ্রহণযোগ্যতা বাড়ে। সেনা-বাহিনী এই সমস্ত গবেষণালব্ধ 'প্রোটো-টাইপ' অস্ত্রাদি পরীক্ষা করে তাদের মতামত দিতে সম্মত হয়। ভারতের সমস্ত বড় বড় রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্পগুলির প্রধানদের একজোট করে একটি কমিটি তৈরি করা হয়, যারা সেনাবাহিনীর বরাত পাবে এবং অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে ও গোপনীয়তা বজায় রাখবে এই প্রতিশ্রুতিতে সেনাবাহিনীর জন্য এ উৎপাদন করবে বলে চুক্তিবদ্ধ হয়।

কালামের নেতৃত্বে এই পুনর্গঠন প্রক্রিয়া সম্পন্ন হলে ১৯৮২ সালে ভারতের সংসদে একটি প্রশ্নোত্তর পর্বে তৎকালীন প্রতিরক্ষা মন্ত্রী বলেন যে ভারত ক্ষেপণাস্ত্র-ভিত্তিক একটি দীর্ঘকালীন প্রতিরক্ষা পরিকল্পনা নির্মাণ করেছে। (প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে বাজপেয়ীর প্রধানমন্ত্রীত্বের সময় ভারতের যে 'নিউক্লিয়ার ডকট্রিন' প্রচারিত হয়, তা এই পরিকল্পনারই একটি পরিবর্ধিত ও পরিমার্জিত রূপ, যেখানে সাবেকি ক্ষেপণাস্ত্রের সঙ্গে পরমাণু বোমা এবং অন্যান্য পারমাণবিক শক্তি-ভিত্তিক অস্ত্রসম্ভারও যুক্ত হয়েছে)। তৎকালীন প্রতিরক্ষা মন্ত্রীর সংসদে একটি বিবৃতি থেকে জানা যায় যে ১৯৮২ সালের শেষ দিনেই ভারতে ট্যাঙ্ক-বিধ্বংসী এবং ভূমি-থেকে-ভূমি ক্ষেপণাস্ত্র নির্মাণের পরিকাঠামো তৈরি হয়ে গেছে।

১৯৯৮ সালে আবদুল কালাম পাঁচটি ভিন্ন ধরনের ক্ষেপণাস্ত্র নির্মাণের প্রকল্প গ্রহণ করেন। সেই পাঁচটি প্রকল্প যথাক্রমে *পৃথ্বী*, *ত্রিশূল*, *অগ্নি*, *আকাশ* এবং *নাগ*। 'মৌলিক এবং শান্তির জন্য মহাকাশ গবেষণা'-র ছদ্ম আবরণ কালাম নিজেই ঘুচিয়ে দেন। তিনি প্রকাশ্যেই ঘোষণা করেন যে ভারতের মহাকাশ গবেষণা সংস্থা তাদের *রোহিনী*-পরবর্তী কৃত্রিম উপগ্রহ-সদৃশ বস্তুর জন্য যে তরল-জ্বালানির ইঞ্জিন নির্মাণ করেছে *পৃথ্বী* ক্ষেপণাস্ত্র সেটি ব্যবহার করবে, এবং মহাকাশ গবেষণা কেন্দ্র তারপর এই ইঞ্জিনটিকে বিভিন্ন প্রজন্মের *পৃথ্বী* ক্ষেপণাস্ত্রের জন্য উপযোগী করে নির্মাণ করবে।

১৯৮৩ সালের জুলাই মাসে ভারতের মন্ত্রীসভা সরকারিভাবে ভারতের নিয়ন্ত্রিত ক্ষেপণাস্ত্র গবেষণাকে স্বীকৃতি দেয় এবং সামরিক খাত থেকে ইস্রো-কে বেশ কিছুটা অর্থ (সামরিক খাত বলে পরিমাণ জানা যায়নি) এবং ক্ষেপণাস্ত্র প্রকল্পকে ৩৮০ কোটি টাকা বরাদ্দ করে। এই ঘোষণায় বলা হয় যে, স্বল্প-পাল্লার নিয়ন্ত্রিত ক্ষেপণাস্ত্রগুলি হবে *পৃথ্বী*, মধ্যম পাল্লার *অগ্নি*, ট্যাঙ্ক-বিধ্বংসী ক্ষেপণাস্ত্র *নাগ*, ভূমি-থেকে-আকাশ, স্বল্প দূরত্ব এবং স্বল্প উচ্চতার ক্ষেপণাস্ত্র *ত্রিশূল* এবং দূর-মধ্যম পাল্লার ভূমি-থেকে-আকাশ ক্ষেপণাস্ত্র *আকাশ*। চণ্ডীগড়ের সেমি-কন্ডাকটার কমপ্লেক্স লিমিটেড তাদের কারখানার প্রয়োজনীয় পরিবর্তন করে এই পাঁচ ধরনের নিয়ন্ত্রণের জন্য যে অতি বৃহৎ মাত্রার সংযুক্ত বৈদ্যুতিন সার্কিট প্রয়োজন হবে তা নির্মাণের, পরীক্ষার এবং ক্রমাগত উন্নতি সাধনের পরিকাঠামো নির্মাণ সম্পন্ন করে। ক্ষেপণাস্ত্রগুলি উৎক্ষেপণের জন্য উড়িষ্যার বালেশ্বরের কাছে বালিয়াপাল-কে জাতীয় পরীক্ষামূলক উৎক্ষেপণ স্থান হিসেবে বেছে নেওয়া হয় এবং বহু মানুষ ঐ অঞ্চল থেকে উচ্ছেদ হয়ে যান। অনেকেরই হয়তো বালিয়াপাল-চাঁদিপুর-ভোগরাই অঞ্চলের উচ্ছেদ হওয়া মানুষদের গৌরবময় দীর্ঘ সংগ্রামের কথা মনে আছে।

ক্ষেপণাস্ত্র প্রকল্পের সফল রূপায়ণের উদ্দেশ্যে কালাম আবার দ্বিতীয় বারের জন্য বোমারু-বিজ্ঞানীদের খোঁজে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় এবং স্বশাসিত গবেষণা কেন্দ্রগুলিতে সফর শুরু করেন এবং অচিরেই প্রায় ৩০০ বিজ্ঞানী ও প্রযুক্তিবিদকে এই যুদ্ধ-গবেষণায় সামিল করতে সক্ষম হন।

অন্যান্য সংগঠনগুলোর সঙ্গে আলোচনা করে ১৯৮৭ থেকে কালাম *পৃথ্বী* এবং অন্যান্য ক্ষেপণাস্ত্রগুলির পরীক্ষামূলক উৎক্ষেপণ শুরু করার সিদ্ধান্ত নেন। কিন্তু তখনও এদেশের গবেষণা এবং প্রযুক্তি-সক্ষমতা এতদূর এগোয় নি যে ভারতে উৎপাদিত যন্ত্রপাতি বা প্রযুক্তি দিয়ে এই লক্ষ্যমাত্রা বজায় রাখা সম্ভব হবে। তাই আবার দ্বৈত-প্রযুক্তির আশ্রয় নেওয়া হয়। ভারতের জ্যোতির্বিদ্যা গবেষণা কেন্দ্রকে সামনে রেখে পর্যবেক্ষণমূলক জ্যোতির্বিদ্যার মোড়কে দ্রুত এবং উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন কমপিউটার, ত্রি-অক্ষ পরিমাপ যন্ত্র, সূক্ষ্ম নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদি নানা জাতের পসরা ক্রয় করা হয়, যেগুলির সামান্য পরিবর্তন করলেই এগুলিকে ক্ষেপণাস্ত্রে (*অগ্নি*, *পৃথ্বী* বা *ত্রিশূল*-এ) ব্যবহার করা সম্ভব।

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় এবং বাঙ্গালুরুর ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ সায়েন্স-এর দুটি গবেষক দল যথাক্রমে *পৃথ্বী* ক্ষেপণাস্ত্রর জন্য 'নিয়ন্ত্রণ অ্যালগরিজম' এবং ক্ষেপণাস্ত্রের নির্ভুলভাবে লক্ষ্যবস্তুকে আঘাত করার সম্ভাব্য কক্ষপথ ও অন্যান্য বিষয় কম্পিউটার প্রোগ্রামের মারফত সম্পন্ন করার (পরিভাষায় যাকে বলা হয় 'কমপিউটার সিমিউলেশন') কমপিউটার কোড নির্মাণ করেন। আইআইটি খড়গপুরে *আকাশ*-এর জন্য 'মিলিমেট্রিক অ্যান্টেনা' নির্মিত হয়।

ভারত ততদিনে বহনযোগ্য ট্যাঙ্ক-বিধ্বংসী ক্ষেপণাস্ত্র তৈরি করার মধ্য দিয়ে হায়দ্রাবাদের ভারত ডায়নামিক্স লিমিটেডকে ভারতের ভবিষ্যতের সমস্ত ধরনের সম্ভাব্য ট্যাঙ্ক-বিধ্বংসী ক্ষেপণাস্ত্র এবং তার যন্ত্রাংশ উৎপাদনে সক্ষম করে তুলেছে। ১৯৮৫ সালের ১৬ সেপ্টেম্বর ভারত সর্বপ্রথম *ত্রিশূল* (ভূমি-থেকে-আকাশ) ক্ষেপণাস্ত্রের পরীক্ষামূলক উৎক্ষেপণে সফল হয়।

এতদিন স্বল্প পাল্লার ক্ষেপণাস্ত্র তৈরির দিকেই ভারত সরকারের মনোযোগ ছিল। কিন্তু ইস্রো-র বিজ্ঞানীরা সৈন্যবাহিনীকে বোঝাতে সক্ষম হন যে, ভারত সরকার যদি মহাশূন্য পাড়ি

দেওয়ার জন্য মহাকাশযান নির্মাণের প্রকল্প হাতে নেয়, তাহলে ঐ সমস্ত মহাকাশযান নির্মাণ, উড়ান, উৎক্ষেপণ, নিয়ন্ত্রণ এবং মহাকাশযান প্রেরিত নানান চিত্র এবং তথ্য থেকে আন্তঃমহাদেশীয় দূরপাল্লার ক্ষেপণাস্ত্র নির্মাণও সম্ভব। *ত্রিশূল* এবং *অগ্নি*-র প্রাথমিক সাফল্য দেখে উৎসাহিত হয়ে ভারত সরকারও ১৯৯০ থেকে মহাকাশযান-নির্ভর মহাকাশ গবেষণার প্রকল্প হাতে নেয়।

১৯৮৬ সালের শেষে ভারত মার্কিন দেশ থেকে ক্রে সুপার কমপিউটার কিনতে সক্ষম হয়। বাঙ্গালুরুর সুপার কমপিউটার রিসার্চ সেন্টার নামক একটি নিরামিষ স্বশাসিত সংস্থার মাধ্যমে ইস্‌রো এবং প্রতিরক্ষা গবেষণা সংস্থা কমপিউটার এডেড ডিজাইন-এর মাধ্যমে ক্ষেপণাস্ত্রর অনেকগুলি সম্ভাব্য নক্সা তৈরির জন্যকমপিউটার এডেড ডিজাইন-এর মাধ্যমে ক্ষেপণাস্ত্রর অনেকগুলি সম্ভাব্য নক্সা তৈরির জন্য এই কমপিউটারটির ব্যবহার শুরু করে । ১৯৮৮ সালে এসে দেখা যায় যে, ভারতের প্রতিরক্ষা গবেষণা কেন্দ্র এবং ইস্‌রো-র তত্ত্বাবধানে থাকা ১৯টি গবেষণাক্ষেত্র ছাড়াও সারা দেশের আরও ২১টি স্বশাসিত সংস্থা, ৬টি বেসরকারি সংস্থা এই ক্ষেপণাস্ত্র উৎপাদন প্রকল্পের অংশীদার হয়ে উঠেছে। ১৯৮৯-এ ইস্‌রো-র 'মহাকাশ গবেষণা'র ফল হিসাবে ভারতের বেশ কিছু রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থা ক্ষেপণাস্ত্রর জন্য প্রয়োজনীয় প্রযুক্তি এবং তরল ও কঠিন জ্বালানি উৎপাদনের সক্ষমতা অর্জন করেছে।

১৯৮৯ সালের ২২ মে ক্ষেপণাস্ত্র রেঞ্জ থেকে *অগ্নি* ক্ষেপণাস্ত্রের সফল উৎক্ষেপণ হয়। সিআইএ-র প্রধান একটি বিবৃতিতে বলেন ভারত সরকার থার্মোনিউক্লিয়ার বোমার প্রস্তুতি নিচ্ছে। শুধু তাই নয়, সে তার ক্ষেপণাস্ত্র প্রকল্পকে নিউক্লিয়ার-সক্ষম করে তুলতে চাইছে। এ নিয়ে সব জল্পনার অবসান হয় যখন ভারতের তৎকালীন প্রতিরক্ষামন্ত্রী শ্রী কে সি পন্থ মহাশয় এক বিবৃতিতে বলেন যে, ভারতের *অগ্নি* ক্ষেপণাস্ত্রের সাবেকি বিস্ফোরক ছাড়াও অন্যান্য 'আধুনিক' মারণাস্ত্র বহনের ক্ষমতা রয়েছে।

১৯৯০ সালে ডুবোজাহাজ থেকে নিক্ষেপযোগ্য মধ্যম পাল্লার জল-থেকে-আকাশ সাগরিকা ক্ষেপণাস্ত্র নির্মাণের সিদ্ধান্ত পাকা হয়। পাশাপাশি, দৃষ্টিশক্তির বাইরে বিচরণকারী লক্ষ্যবস্তু ভেদের জন্য আকাশ-থেকে-আকাশ প্রজাতির *অস্ত্র* ক্ষেপণাস্ত্রের নক্সা তৈরির সিদ্ধান্ত হয়।

চন্দ্রশেখর প্রধানমন্ত্রী থাকাকালীন (১৯৯০-এর শেষে) সিদ্ধান্ত হয় যে এখন থেকে নিউক্লিয়ার সংক্রান্ত যে কোনো সিদ্ধান্ত নেওয়ার বিষয়ে সেনাবাহিনীর তিন প্রধানেরও পরামর্শ নেওয়া হবে। এ সিদ্ধান্ত আজও বলবৎ রয়েছে। ১৯৯২ সালে ইস্‌রো-র মুখ্য উৎপাদক, এরোনটিক্যাল ডেভলপমেন্ট এস্টাবলিশমেন্টকে 'সাগরিকা' ক্ষেপণাস্ত্রর মূল কাঠামো নির্মাণের ভার ন্যস্ত করা হয়। তারা বলে ইস্‌রো-র জন্য তারা যে দ্বৈত-প্রযুক্তি-ভিত্তিক কাজ করেছিলো, সেই অভিজ্ঞতার কারণেই তারা *সাগরিকা*-র বরাত পেয়েছে।

নরসীমা রাও-এর প্রধানমন্ত্রীত্বের সময় ভারতে সরকারিভাবে বিশ্বায়ন চালু হওয়ার পর যুদ্ধাস্ত্র বিষয়ক যাবতীয় গোপনীয়তার বেড়াজাল বজায় রাখার আর কোনো দায় ভারত সরকারের রইলো না। ১৯৯৩ সালের মার্চ মাসে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী নরসীমা রাও প্রকাশ্যে ঘোষণা করলেন যে এতদিন পর্যন্ত সরকারিভাবে ঘোষিত 'শান্তির জন্য মহাকাশ গবেষণা কেন্দ্র' ইস্‌রো *অগ্নি* ক্ষেপণাস্ত্রের জন্য জ্বালানি তৈরি করবে, যাতে *অগ্নি* ক্ষেপণাস্ত্রকে দ্রুত ভারতীয় সেনাবাহিনীর অস্ত্রসম্ভারের অন্তর্গত করা সম্ভব হয়। ১৯৯৩ সালের একটি রিপোর্ট (*হিন্দুস্থান টাইমস*, ২২.৫.১৯৯৩) থেকে জানা যায় যে ভারতীয় সেনাবাহিনীর ১১তম কর্পস-এর যে অংশটি পাকিস্তানের সীমান্ত বরাবর রয়েছে, তাদের অস্ত্রভাণ্ডারে *পৃথ্বী* ক্ষেপণাস্ত্র রয়েছে। অক্টোবর ১৯৯৩-এর মধ্যেই ভারতীয় সেনাবাহিনীর আর্টিলারি বিভাগের নিয়মিত অস্ত্ররূপে *পৃথ্বী* অন্তর্ভুক্ত হয়।

১৯৯৪-এর গোড়ায় ভারত সরকার ২২০ কিমি পাল্লার আন্তঃদেশীয় ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র প্রকল্পের কথা ঘোষণা করে। সেনাবাহিনীর চিফ্ অফ স্টাফ শ্রী হরওয়ান্ত সিং বলে বসেন যে *অগ্নি*-কে নিউক্লিয়ার অস্ত্র বহন-সক্ষম না করে তুলতে পারলে সেনাবাহিনীর এই ক্ষেপণাস্ত্র নিয়ে খুব একটা উৎসাহ নেই। ফলে আবার পরমাণু গবেষণা ও মহাকাশ গবেষণার মধ্যে গাঁটছড়া আরো দৃঢ় হওয়ার যে অবস্থার সৃষ্টি হয় যা আজও চলছে। ইতিমধ্যে কেবলমাত্র *পৃথ্বী* ক্ষেপণাস্ত্র দ্বারা সজ্জিত ভারতের সেনাবাহিনীর মধ্যে ৩৩৩-তম ক্ষেপণাস্ত্র গোষ্ঠী গঠিত হয়।

৩০শে জুন, ১৯৯৭, ভারতের সেনাবাহিনীর ভূতপূর্ব চিফ-অফ স্টাফ জেনারেল সুন্দরজী মন্তব্য করেন যে, মহাকাশ গবেষণার ফল হিসেবে আমরা সাবেকি অস্ত্র-সজ্জিত *পৃথ্বী* ক্ষেপণাস্ত্র পেয়েছি। নিউক্লিয়ার গবেষণার ফল হিসেবে আমরা যে কোনও সময় *পৃথ্বী*-কে নিউক্লিয়ার অস্ত্র-বহন-সক্ষম করে তুলতে পারি (*ইন্ডিয়া টুডে*, জুন ৩০, ১৯৯৭, পৃ. ৭৩)।

আগস্ট ১৯৯৭-তে ভাবা পরমাণু গবেষণা কেন্দ্রর নিউক্লিয়ার বোমা উৎপাদন গোষ্ঠী *পৃথ্বী* ক্ষেপণাস্ত্রে বহনযোগ্য বোমার প্রোটো-টাইপ উৎপাদন করে। মূল বোমা ১৯৯৮-এর গোড়ায় নির্মাণ সম্ভব হবে বলে তাঁরা জানান। ১৭ই মে, ১৯৯৮ পোখরান-২ বিস্ফোরণের মাধ্যমে ভারত সরকারিভাবে 'শান্তির জন্য পরমাণু' প্রকল্প ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে সদর্পে বোমার জন্য পরমাণু প্রকল্পের কথা ঘোষণা করে। *পৃথ্বী*-র একটি পরিমার্জিত রূপ, *ধানুষ* ক্ষেপণাস্ত্র প্রকল্প হাতে নেওয়া হয়। *ধানুষ* প্রকল্পের যাবতীয় প্রযুক্তি এসেছিল ইস্‌রো-র পরপর কয়েকটি কৃত্রিম উপগ্রহ উৎক্ষেপণ থেকে।

১৯৯৯-এর এপ্রিল মাসে আবদুল কালাম বলেন যে, *অগ্নি*-২ ক্ষেপণাস্ত্র নিউক্লিয়ার অস্ত্র বহনে সক্ষম, বস্তুত ১৯৯৮-এর মে মাসে যে পরীক্ষামূলক পোখরান-২ বিস্ফোরণ ঘটানো হয়েছিল তার সমতুল্য ক্ষমতার নিউক্লিয়ার বোমা বহনে *অগ্নি*-

২-এর বর্তমান নক্সাই যথেষ্ট। ১৯৯৯-এর মে-জুন মাসে যে কার্গিল সংঘর্ষ ঘটে, তাতে একটি *অগ্নি*-২ ক্ষেপণাস্ত্রে সত্যি সত্যিই নিউক্লিয়ার বোমা যুক্ত করা হয়।

শেষ কথা

ভারত সরকার ক্রমাগত তার ক্ষেপণাস্ত্রর বৈচিত্র্য বাড়িয়েই চলেছে। এই প্রতিটি উন্নতি ঘটছে তার নিরামিষ মহাকাশ গবেষণার হাত ধরে। *পিএসএলভি*, *এএসএলভি* এবং অন্যান্য মনুষ্যহীন বাইরে থেকে নিয়ন্ত্রিত এবং স্বনিয়ন্ত্রিত প্রযুক্তির যত উন্নতি ঘটছে, জ্বালানি, মোটর, বুস্টার এবং ক্ষেপণ-পরিবহন ব্যবস্থার যত উন্নতি হচ্ছে, ততই সেই সমস্ত দ্বৈত-চরিত্রের প্রযুক্তিগুলি ভারতের ক্ষেপণাস্ত্র প্রকল্পে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিচ্ছে।

২০১১ সালের ১১ই জুন ভারতের তৎকালীন চিফ এয়ারমার্শাল পি ভি নায়েক সদর্পে ঘোষণা করেছিলেন যে, 'ভারতের এখনই আগ্রাসী উপায়ে আন্তঃমহাদেশীয় ক্ষেপণাস্ত্র তৈরিতে মন দিতে হবে, ক্ষেপণাস্ত্রর সীমা বাড়িয়ে ১০,০০০ কিমি বা তারও বেশি করা জরুরি' (*হিন্দুস্তান টাইম্‌স্*, ১০.৬.২০১১)। এই কাজ করতে গেলে যে গবেষণা ও প্রযুক্তি প্রয়োজন তারই মহড়া হিসেবে ভারতের চন্দ্রায়ন প্রকল্প, মঙ্গল-অভিযান প্রকল্প। একথা সত্যি যে মহাকাশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি গবেষণা একটি দুমুখো ছুরি— বর্তমানে তা যাদের হাতে তারা সেটির মারণ ব্যবহারে সিদ্ধহস্ত, পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে এই একই প্রযুক্তি মানবকল্যাণে ব্যবহার করা সম্ভব। যে সমাজ-বিপ্লব মহাকাশ প্রযুক্তির এই কল্যাণকর দিকটি উন্মুক্ত করবে, তার অপেক্ষায় থাকা আর ধ্বংসের বিরুদ্ধে সরব হওয়া বর্তমান মহাকাশ ও পরমাণু বিজ্ঞানীদের অবশ্য-কর্তব্য।

উপসংহারে আমরা বলতে পারি যে সাধারণভাবে বিশ্বে ও বিশেষভাবে আমাদের দেশে আধুনিক বিজ্ঞান প্রযুক্তি যেভাবে এগিয়ে গেছে তাকে মানব কল্যাণে কাজে লাগিয়ে সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রার মান অনেকটাই বাড়িয়ে দেওয়া সম্ভব। অনেক দেশে এই কাজটি সামান্য হলেও সম্ভব হয়েছে। কিন্তু তা করার জন্য প্রয়োজন বিজ্ঞান-প্রযুক্তি গবেষণার দিশা পরিবর্তনের। আমাদের দেশের ক্ষেত্রে এই গবেষণার বর্তমান দিশ জনবিরোধী এবং গোপনীয়তার আবরণে ঢাকা। যে সমস্ত বিষয়ে গবেষণা প্রত্যক্ষভাবে মানবকল্যাণে নিয়োজিত, সেই ক্ষেত্রগুলির গবেষণায় অর্থও কম, উৎসাহ দেওয়ার পরিবর্তে সেগুলিকে প্রায় ব্রাত্য করে রাখা হচ্ছে। যে সব গবেষণায় বেআইনি অর্থ লেনদেন রয়েছে, কোনও সামাজিক দায়বদ্ধতা নেই, সেইগুলি এখন শাসকদের চোখের মণি। ঠেক যেমন সাধারণ মানুষের টাকা আত্মসাৎ করে ঘুষ আর কিক-ব্যাকের রমরমা, ঠিক তেমনি বিজ্ঞান-প্রযুক্তি গবেষণা ক্ষেত্রেও সাধারণ মানুষের টাকা আত্মসাৎ করে যুদ্ধ-গবেষণা চলছে। এই সমস্ত গবেষণা দেশকে আত্মনির্ভর করার বদলে পরনির্ভর করে তোলে। পরাধীন ভারতে বিজ্ঞানী-প্রযুক্তিবিদরা জ্ঞানবিজ্ঞান চর্চার দেশীয় ধারাকে পুষ্ট করে স্বাধীন জাতি হিসেবে আত্মপ্রকাশের স্বপ্ন দেখেছিলেন, দেশের বর্তমান নীতি-নির্ধারকরা তার বিপরীত পথে চলেছেন।

ডাঃ সমীর বিশ্বাসের বিরুদ্ধে সমস্ত মামলার নিঃশর্ত প্রত্যাহার চাই

৯ পৃষ্ঠার পর

দেখিয়ে তাঁকে শুধু গ্রেপ্তারই করা হলো না, তিনমাস কারান্তরালে রেখে দেওয়া হলো। তাতেও যথেষ্ট হয় নি। বার বার তাঁর জামিন প্রত্যাখ্যাত হয়েছে। শুধু তাই নয়, ৬৮ বছর বয়স্ক, ইসিএল-এর কাল্লা হাসপাতালের প্রাক্তন ডেপুটি ডিরেক্টর এই চিকিৎসককে কোর্ট থেকে জেলে নিয়ে যাওয়া হলো ট্রেনের প্রকাশ্য কামরায় হাতকড়া পরিয়ে, যদিও খুব বিশেষ কিছু ক্ষেত্র ছাড়া হাতকড়া পরানো আমাদের দেশের আইনে নিষিদ্ধ।

ঘটনার সূত্রপাত ২০১০ সালের ১৮ এপ্রিল। সেদিন রাতে পুলিশ তাঁর কোয়ার্টারে হানা দেয়। অভিযোগ, তিনি মাওবাদীদের চিকিৎসা করেন, তাঁর কোয়ার্টারে নাকি নিষিদ্ধ সংগঠনের কাগজপত্র পাওয়া গেছে।

ডাক্তারির পাশাপাশি মানবাধিকার কর্মী, তৎকালীন সিঙ্গুর-নন্দীগ্রাম-লালগড় আন্দোলনের পাশে দাঁড়ানো এই দরদী ডাক্তারবাবুর উপর সেই পুলিশি হামলার বিরোধিতা করেন আসানসোলের মানুষ, পাশাপাশি তৎকালীন বিরোধী দল আর বর্তমানের শাসক দলের নেতা-কর্মীরা। আসানসোলের মানুষজন জানাচ্ছেন, বর্তমান আইনমন্ত্রীও ছিলেন সেই বিরোধিতায়।

আশ্চর্যের বিষয় এই যে, ২০১০ সালের সেই পুরনো মামলাকে খুঁচিয়ে তুলেই ২০১৩ সালে ডা: বিশ্বাসকে গ্রেপ্তার করা হলো সেই আইনমন্ত্রীর মন্ত্রীত্বকালে। অথচ নির্বাচনের আগে বর্তমান শাসকদলের প্রতিশ্রুতি ছিল, রাজনৈতিক কারণে প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য যেসব মানুষের বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা দায়ের করা হয়েছিল, সেগুলি তুলে নেওয়া হবে, বন্দীমুক্তি দেওয়া হবে। শাসনক্ষমতায় আসার পর সেসব প্রতিশ্রুতি তাঁদের স্মরণে আছে, এমনটা মনে হচ্ছে না।

ডা: সমীর বিশ্বাসকে গ্রেপ্তারের পর আসানসোল সিভিল রাইট্‌স অর্গানাইজেশন, এপিডিআর-এর মতো সংগঠনগুলি তার প্রতিবাদ করেছেন। কিন্তু আশ্চর্য, চিকিৎসকদের সংগঠনগুলি নীরব। এসব 'সাংঘাতিক' ব্যাপারে তারা হাত দিতে চান না, বিশেষত শাসকদল যখন তার বিরুদ্ধে!

সংযোজন : ডা: বিশ্বাসকে গ্রেপ্তারের পর ৯০ দিন হয়ে যাওয়ার পরও চার্জশিট দিতে পারেনি পুলিশ। ৯০ দিন অতিক্রান্ত হওয়ার পর ১২ মার্চ তাঁকে জামিন দেওয়া হয়েছে। কিন্তু বলা বাহুল্য, মামলা চলবে। তাই প্রতিবাদের প্রয়োজন একটুও কমেনি।

মিতা দত্ত

স্মরণ

মণিভূষণ ভট্টাচার্য স্মরণে

সব্যসাচী দেব

এ লেখাটি মণিভূষণের কবিতার আলোচনা বা মূল্যায়ণের চেষ্টা নয়, এমনকী তাঁর কোনো সামগ্রিক পরিচয়ও উন্মোচিত হবে না এখান থেকে। এটি শুধু তাঁর প্রয়াণের পর তাঁর এক মগ্ন পাঠকের, যার কিছুটা সৌহার্দ্য হয়েছিল কবির সঙ্গে, ব্যক্তিগত সেই স্মৃতির সূত্রে, তাঁকে একবার ফিরে দেখা, তাঁকে নিয়ে দু-এক কথা মাত্র, এলোমেলো কয়েক টুকরো।

মণিভূষণ ভট্টাচার্যের কবিতার সঙ্গে প্রথম পরিচয় তাঁর প্রথম কবিতার বই 'কয়েকটি কণ্ঠস্বর' দিয়েই। কলেজের ছাত্র তখন, আকণ্ঠ ডুবে থাকছি কবিতায়, সব কবিতারই বইয়ের অবধারিত গতি যেখানে এবং যা হয়ত কিছুটা গৌরবেরও, সেই কলেজ স্ট্রিটের পুরনো বইয়ের দোকানে পেয়ে যাই 'কয়েকটি কণ্ঠস্বর'। কবিতর নাম অপরিচিত, নেহাৎই কৌতূহলে পাতা ওল্টানো, দু-একটা পড়েই একটা টান লাগে, বইটি কিনে ফেলি।

সেই বইয়ে যে কবিতাগুলি পড়েছিলাম তার মধ্যে মুগ্ধ করেছিল 'কয়েকটি কণ্ঠস্বর' নামে কবিতাটির এই সব পঙ্‌ক্তি— 'কারণ পোষাক নেই সেহেতু আমার মৃতদেহ/ ফুটপাতে পড়ে আছে। পৌরসভা বড়োই দয়ালু,/ চুক্তিবদ্ধ শকুনেরা বুকে নিয়ে অনবদ্য স্নেহ/গোল হয়ে বসে আছে। নাগরিক শিরঃপীড়া মুগ্ধ করে তালু'। চমকিত হয়েছিলাম অন্তর্নিহিত শ্লেষে আর তার কাব্যিক নির্মাণে। পাশাপাশি সেই তরুণ বয়সে আপ্লুত হয়েছিলাম 'বর্ষার রাত' কবিতার এই সব উচ্চারণে— 'ঝিনুকে রাত্রির জন্ম, ক্ষীণমাত্র পরমায়ু তার,/দু'বাহুর অবরোধে অধরের আরক্ত শপথে/উন্মোচিত রক্তপদ্ম নিঃশ্বাসে জড়ায় অন্ধকার;/বাতাসের হাহাকার অবিরল বৃষ্টিঝরা পথে'। তখন মুগ্ধতাই ছিল শুধু, পরে মনে হয়েছিল তাঁর ওই সব কবিতার মধ্যে ছিল কিছুটা বিষাদ, কিছুটা আত্মমগ্নতা আর শান্ত রোম্যান্টিকতা। খুব যে উঁচু স্বরে কথা বলেছেন মণিভূষণ তা নয়, কিন্তু এই শান্ত ভঙ্গিটিই মনে রাখার মতো। তারপর দীর্ঘদিন তাঁর কোনো বই বেরোয়নি। লিখে গেছেন ঠিকই, এমনকী ইতিমধ্যেই বয়স্ক হয়ে ওঠা 'কৃত্তিবাস'-এও লিখছেন তিনি। ইতিউতি আরও কোনো কোনো পত্রিকায় চোখে পড়ছে তাঁর লেখা। 'কৃত্তিবাস'-এই তো বেরোলো তাঁর বিখ্যাত 'গৃহপ্রবেশ' যা পরে জায়গা পাবে 'উৎকণ্ঠ শর্বরী'-তে। যেখানে ছিল ছন্দোনিপুণ কারিগরির ভিতরে বহমান ইতিহাসচেতনা— 'ওরা তো জানে না এমনই খেলায় কেঁপেছে সুরজগড়—/ত্রস্ত রোটাস, বিচূর্ণ বারানসী—/এমন বিকেলে দূত পাঠিয়েছে রাজমহিষীর ভ্রাতা—/বলে দাও, আজ ভীষণ ব্যস্ত, দ্রুত—/বাড়ির নক্‌শা, বলা বাহুল্য, হয়নি মনঃপূত। 'অবশেষে ১৯৭১-এ প্রকাশিত হলো 'উৎকণ্ঠ শর্বরী'।

'উৎকণ্ঠ শর্বরী'-তে স্বাভাবিক ভাবেই তিনি আরও পরিণত। আত্মমগ্নতা সত্ত্বেও আগের বইটিতেই ছিল বাইরের দিকে তাকানোরও বেশ কিছু নমুনা, এবার তা যেন আরেকটু স্পষ্ট হলো। যদিও 'উৎকণ্ঠ শর্বরী' বিশিষ্ট হয়ে উঠল দুটি ভিন্নধর্মী প্রবণতার জন্য। এই বইয়ে আছে একগুচ্ছ কবিতা, সবকটিই সনেট। আলাদা করে তারা চিহ্নিত 'রাজহাঁস' বলে। এই গুচ্ছটিকে মনে রাখা দরকার। এখানে ছিল এরকম পঙ্‌ক্তি— 'স্বপ্নে তোর জন্য আমি বড়ো দিঘি কেটে দেব।' এই স্বপ্নপ্রস্থানই সামগ্রিক সুর না হলেও এখানে আছে প্রবল রোম্যান্টিকতা। হয়ত তা কিছুটা অনির্দেশ্যও। এই রোম্যান্টিকতার সামনে দাঁড়িয়ে একটা জিজ্ঞাসা তৈরি হয়— এই রাজহাঁসটি কে! কীসের প্রতীক সে! কখনও মনে হয় কবি এখানে সম্বোধন করছেন তাঁর প্রেমিকাকে, নাকি প্রেমকেই, আবার মনে হয় এই সনেটগুলিতে কবি যেন নিজেকেই বলছেন যা বলার, রাজহাঁস হয়ে উঠছে তাঁরই দ্বিতীয় সত্তা।

যখন লিখছেন এই সনেটগুচ্ছ, সেই সময়টা কেমন! বাষট্টিতে তাঁর প্রথম বই বেরোনর বছরেই ভারতের চীন-যুদ্ধ, তার জের টেনে তিন বছরের মধ্যে কম্যুনিস্ট পার্টির প্রথম ভাঙন, সারা দেশ জুড়ে কম্যুনিস্ট পার্টির কর্মীদের গ্রেপ্তার, উদগ্র ও উৎকট দেশপ্রেমের বন্যা, ছেষট্টির খাদ্য-আন্দোলন, প্রেসিডেন্সি কলেজের ছাত্র-আন্দোলন, সাতষট্টির নির্বাচনে কংগ্রেসের বিপর্যয়, বামপন্থীদের ক্ষমতায় আসা, যাদের মধ্যে ছিল ভাগ-হওয়া কম্যুনিস্ট পার্টির দুই অংশই। তার অল্প দিন পরেই তরাইয়ে বসন্তের বজ্রনির্ঘোষ। তারপর নূতন পার্টি— সিপিআই(এম-এল)। 'উৎকণ্ঠ শর্বরী' প্রকাশিত হওয়ার আগেই ঘটে গেছে রাষ্ট্রযন্ত্রের হাতে সরোজ দত্ত ও চারু মজুমদার-এর হত্যা। কী করে কবি এড়াবেন এই সমকালকে! এড়াতে তো চাননিও তিনি। সময়ের স্পষ্ট ছাপ রয়ে গেল 'উৎকণ্ঠ শর্বরী'-র শেষ কবিতায়। সেখানে তিনি লিখছেন— 'পিছমোড়া হাত-পা-বাঁধা আটটি যুবকের দেহ পড়েছিল ঠাণ্ডা বারাসাতে/ষোলটি নিঃশ্বাস গিয়ে বিঁধেছিল নক্ষত্রের নীল রশ্মিরেখা,/বীরের এ রক্তস্রোত মাতার এ অশ্রুধারা/নির্মম পাথরে হল লেখা।' (দিনলিপি)। মণিভূষণ এখন নির্দিষ্ট করে নিতে চাইছেন তাঁর কবিতার ভুবনকে। এখন তিনি সহজেই বলতে পারেন— 'একপাটি পায়ে রাখো, অন্য পাটি ছুঁড়ে দাও/নিরপেক্ষ কবিদের মুখে।' (দিনলিপি)। 'উৎকণ্ঠ শর্বরী'-র পর যেন অবধারিত ছিল

'গান্ধীনগরে রাত্রি'।

এই বই থেকেই মণিভূষণকে দেগে দেওয়া হলো রাজনৈতিক কবি বলে। একজন কবি, বা যে-কোনো শিল্পীরই তো থাকে নিজস্ব রাজনৈতিক চেতনা, রাজনৈতিক প্রত্যয়, তাঁর রচনাতেও থাকবে সেই চেতনার ছাপ। কিন্তু তাঁর মূল পরিচয় তো তিনি শিল্পী, কবি বা ঔপন্যাসিক বা অভিনেতা বা অন্য কিছু। একজন মৃৎশিল্পী ঢোকরাশিল্পী সযত্নে নির্মাণ করেন তাঁর শিল্পকর্ম, তাঁকে কেউ বলে না মার্ক্সবাদী ঢোকরাশিল্পী বা গান্ধিবাদী মৃৎশিল্পী। একজন শিল্পী গান্ধিবাদী ও শিল্পী হতে পারেন, মার্ক্সবাদী ও শিল্পী হতে পারেন, কিন্তু মার্ক্সবাদী কবি বললে তার কবিসত্তাকে একটা খাঁচায় আটকে ফেলা হয়। আর সেই খাঁচা পাঠকের মনেও একটা ভুল প্রত্যাশা তৈরি করে। বিশেষত যে পাঠক সংগ্রাম, আন্দোলন ইত্যাদির প্রত্যক্ষ উল্লেখকেই শুধু মনে করেন 'রাজনৈতিক কবিতা' বলে, রাজনীতির অন্তর্লীন রূপ যাঁর চোখে পড়ে না। এই প্রত্যাশার খাঁচাই কিছু পাঠককে পরে মণিভূষণের কবিতা সম্পর্কে বিমুখ করে তুলেছিল।

সে অন্য কথা। সময়ের প্রত্যক্ষ চিহ্ন এবার ধরা থাকল মণিভূষণের কবিতায়, 'উৎকণ্ঠ শর্বরী'-তে যার সূচনা। মনে পড়বে 'কম্পোজিটরকে লেখা চিঠি' কবিতাটির কথা। একজন সাধারণ কম্পোজিটারের জীবন থেকে নিংড়ে নেওয়া সত্য এই কবিতায় উঠে আসছিল, এই বইয়েই ভারতীয় গণতন্ত্রকে বিদ্ধ করছেন তীব্রভাবে। 'গান্ধীনগরে রাত্রি' হয়ে উঠল আরও স্পষ্ট আরও প্রত্যক্ষ। এই বইটি প্রকাশিত হওয়ার অল্প কিছুদিন বাদেই শিয়ালদার এক বইয়ের স্টলের সামনে মণিভূষণের সঙ্গে আমার পরিচয়।

'গান্ধীনগরে রাত্রি' প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই মণিভূষণ একটা প্রবল ধাক্কা লাগালেন বাংলা কবিতার পাঠকের হৃদয় ও মননে। সমকালীন রাজনৈতিক আন্দোলন নিয়ে এর আগেও কবিতা লেখা হয়েছে, সুভাষ মুখোপাধ্যায় লিখেছেন, চল্লিশের দশকে যাঁরা পরিচিত ছিলেন 'বামপন্থী কবি' বলে তাঁরা প্রচুর লিখেছিলেন তেভাগার লড়াই নিয়ে। এমনকী পরে যিনি কোনো রাজনৈতিক দলের সঙ্গে কখনও যুক্ত হননি সেই অলোকরঞ্জন দাশগুপ্তও লিখেছিলেন, তাঁর কবিতায় ছিল বুধাখালি চন্দনপিঁড়ির উল্লেখ। সে হিসেবে মণিভূষণ নূতন কিছু করেননি। নূতনত্ব অন্য জায়গায়, মণিভূষণের কবিতাগুলির প্রত্যক্ষ প্রেরণা যে নকশালবাড়ির আন্দোলন সেই আন্দোলনে। রাষ্ট্রশক্তির বিরুদ্ধে লড়াইয়ে নেমেছিল নকশালবাড়ি, রাষ্ট্র তখন পাতা পড়ার শব্দে কেঁপে উঠছে ভয়ে, সেই সময় সেই লড়াইয়ের স্বপক্ষে বা রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে কিছু বলা ছিল যথেষ্ট বিপজ্জনক, এমনকী প্রতীকী হলেও। মণিভূষণ সেটাই করেছিলেন। আর তা করেছিলেন কোথাও কবিতাকে ক্ষুণ্ণ না করেই। রাজনৈতিক আবেগে তখন অনেকেই উচ্ছ্বাসপ্রবণ হয়ে অজস্র কবিতার মতো পঙ্‌ক্তি লিখেছেন মণিভূষণ কবিতাই লিখেছেন। ফলে 'গান্ধীনগরে রাত্রি'র কবিতায় তাঁর সমকালীন ওই আন্দোলন এক অদ্ভুত ভাষা পেয়ে গেল।

'গান্ধীনগরে এক রাত্রি' কবিতাটির কথা ভাবা যেতে পারে। রাজনৈতিক কবিতা বলতে শ্লোগানমুখরতা বা কোনো কর্মসূচির বিবরণ বা যথাসম্ভব উচ্চগ্রামে ভাষণ-এর যে ধারণা অনেক কবি ও পাঠকের মনে গেঁথে আছে, তা থেকে একেবারেই আলাদা এটি। 'গোকুলকে সবাই চেনে চিনে রাখল ডিআইবি-র লোক/ স্টেট্‌সম্যান পড়ার ফাঁকে আড়চোখে'— এই সূচনা থেকে মনে হয় যেন একটা গল্পের আভাস দিচ্ছেন কবি, তারপরেই চার লাইনে চারটি উক্তি থেকে চারটি ব্যক্তির শ্রেণীচরিত্র ও পেশাগত মানসিকতা স্পষ্ট উঠে আসে। সেই সঙ্গে মণিভূষণের অনুভব করেন কোথাও একটা ফাঁকও থেকে যাচ্ছে। চটকলের ছকু মিঞা, মার্ক্সবাদী তত্ত্ব অনুসারে শ্রমিক শ্রেণীর এই প্রতিনিধির বিপ্লবে নেতৃত্ব দেওয়ার কথা, তার বদলে তার প্রতিক্রিয়া— 'এবার প্যাঁদাব শালা হারামি ওসি-কে'। তাৎক্ষণিক ক্রোধের প্রকাশ মাত্র, এ কোনো বিপ্লবী প্রতিক্রিয়া নয়। একটি পঙ্‌ক্তিতে সংহত করে মণিভূষণ জানিয়ে দেন শ্রমিক শ্রেণীর চেতনার অসম্পূর্ণতার কথা। তবু মনে হতে পারে এখন পর্যন্ত কবিতা একটা বর্ণনাই শুধু। মাঝখানে একটি পঙ্‌ক্তিতে গোকুলের মৃত্যুকে তিনি মহাকাব্যিক দ্যোতনা এনে দিয়েছিলেন— 'শবচক্র মহাবেলা প্রশস্ত প্রাঙ্গণ,/ পাথরে পাথরে গর্জে কলোনির সুভদ্রার শোক'। মনে পড়ে যায় অভিমন্যু বধের কথা, মুহূর্তেই কলোনির এক মায়ের শোক যুক্ত হয়ে যায় মহাভারতীয় মহিমার সঙ্গে। বিবরণ ছাড়িয়ে সেখানেই এটি যথার্থ কবিতা হয়ে উঠেছিল। তারপর তা চূড়ান্ত সিদ্ধিতে পৌঁছয় শেষ দু-পঙ্‌ক্তিতে। 'উনুন জ্বলেনি আর, বেড়ার ধারেই সেই ডানপিটের তেজি রক্তধারা', শোকের সাথে গরিমা মিশে যায় ডানপিটে ও তেজি শব্দ দুটির প্রয়োগে, আর তারপরেই পরের পঙ্‌ক্তি স্তব্ধ করে দেয় পাঠকের সব মুখর প্রশ্নকে— 'গোধূলিগগনে মেঘে ঢেকেছিল তারা'। শুধু কলোনির মায়ের মায়ের ব্যক্তিগত শোক হয়ে থাকে না গোকুলের মৃত্যু, তা পেয়ে যায় এক সর্বজনীন তাৎপর্য, ছায়াঘন স্তব্ধতার এই প্রতিমায় মণিভূষণ নির্মাণ করে দেন এক লড়াইয়ের ব্যাপকতার, জনগ্রাহ্যতার ছবি। রবীন্দ্রনাথের গানকে এই ভাবে ব্যবহার করার দক্ষতাতেই মণিভূষণ মনে করিয়ে দেন তিনি কবিতাই লিখতে চেয়েছেন। কবিতা ছাড়া অন্য কিছু নয়। তাঁর অনেক কবিতার পঙ্‌ক্তিকে শ্লোগান হিসেবে ব্যবহার করা যায়, কিন্তু মণিভূষণ জানতেন কবিতা কবিতাই, শ্লোগান শ্লোগানই। 'গান্ধীনগরে রাত্রি' শুধু বিষয়গৌরবেই মহীয়ান নয়, তা শিল্পমূল্যেও গরীয়ান। এই বইয়ের কবিতায় কখনও প্রত্যক্ষ কখনও পরোক্ষ উল্লেখে মণিভূষণ চিত্রিত করেন ক্ষোভ,

প্রতিবাদ, বিদ্রোহ, আশা— সাধারণ মানুষের চাওয়া-পাওয়া, এক কথায় জীবনকেই রূপায়িত করেন তিনি। ধূপকাঠি-বেচা মহিমের গোপন স্বপ্নের পাশে থাকে ময়দানে সরোজ দত্তর নিহত দেহের কথা, থাকে হাজার হাজার ছেলের লাশের কথা আর তার পাশেই প্রতীকে রূপকে প্রতিমায় উৎপ্রেক্ষায় থাকে চায়ের দোকানের মন্টুর হাতে থেকে-যাওয়া 'ভারতবর্ষের অন্ধকার আকাশে হঠাৎ লাফিয়ে-ওঠা বিদ্যুতের মতো/আট ইঞ্চি লম্বা ঝকঝকে একখানা ছুরি' আর শুভ্রা শ্বেতবসনা সরস্বতীর ঘোর কৃষ্ণবর্ণ নগ্ন কালীকে বদলে যাওয়ার আশ্চর্য উদ্ভাস— 'হাতের পুঁথি নিক্ষিপ্ত হলো সমুদ্রগর্ভে, দেবী/ডান হাত বাড়িয়ে দিলেন ঊর্ধ্ব আকাশে— কেড়ে নিলেন/কালপুরুষের খড়্গ।/ মহাসমুদ্রের সমস্ত নৈশ বর্ণমালা শুষে তাঁর শরীরে উঠে এল/অমাবস্যার ঘোর অন্ধকার—।' (শ্রীপঞ্চমী/গান্ধীনগরে রাত্রি)। সময়কে শুধু চেনেননি মণিভূষণ, পাঠকের মোহনিদ্রা ভেঙে তাকেও চেনাতে চেয়েছিলেন।

'গান্ধীনগরে রাত্রি'র পর স্বাভাবিকভাবেই তার পুনরাবৃত্তি করেননি, কিন্তু এর পর তাঁর কবিতায় রাজনীতির উপস্থিতি খুঁজে পেতে খুব কষ্ট করতে হয় না। এর পর থেকেই মণিভূষণের হাতে পাওয়া গেল বেশ কিছু দীর্ঘ কবিতা। তিনি মনে করছিলেন সমকালীন রাজনৈতিক আন্দোলনগুলিকে বুঝতে এবং কবিতায় তার প্রতিফলন ঘটাতে গেলে ভারতবর্ষের বিশাল পটভূমি, তার ইতিহাস, ঐতিহ্যকে মনে রাখা দরকার; হয়ত সেই পটভূমিকে কবিতায় প্রাপ্য মর্যাদা দেওয়ার জন্য তাঁর মনে হয়েছিল দীর্ঘ কবিতাই যোগ্য। দীর্ঘ কবিতার বিপদ হলো তা অনেক সময় এলিয়ে পড়তে চায়, তার বাঁধন আলগা হয়ে যায়। মণিভূষণ তাঁর দীর্ঘ কবিতায় কখনও সংহতি নষ্ট হতে দেননি। ভাবনায় কোনো অসংলগ্নতা ছিল না বলেই নানা প্রতিমায় তার রূপ গড়ে তুলতে তাঁর কোনো অসুবিধা হয়নি।

কিন্তু 'গান্ধীনগরে রাত্রি' প্রকাশিত হওয়ার পরেই একটি বিপদ তৈরি হলো। আগে যে খাঁচার কথা বলা হলো পাঠকের প্রত্যাশা তার মধ্যে ঢুকে পড়ল, পাঠক চাইতে লাগল কবি ক্রমাগত লিখে যান আন্দোলনের কথা। বুঝতে চান না আন্দোলন যদি বাঁক নেয় বা সাময়িক ভাবে পর্যুদস্ত হয় তখন তা নিয়ে লিখে যাওয়া মানে ক্লান্তিকর পুনরাবৃত্তি করা। মণিভূষণ সেখানেই আটকে থাকতে চাননি। আসলে তিনি যে ঘটনা বা বস্তুকে অবলম্বন করছেন তা কেবলই অবলম্বন, মূল ব্যাপার হলো তাঁর রাজনৈতিক বোধ, বিশ্বাসে ক্রিয়াশীল থাকা। সরাসরি লড়াইয়ের উল্লেখ না থাকলেই পাঠক মনে করতে চান কবি কি সরে গেলেন! সে ধরনের সমালোচনাও চোখে পড়েছে মাঝে মাঝে। আসলে এই চাওয়ার মধ্য দিয়ে পাঠক তার নিজের রোম্যান্টিক স্বপ্নবিলাসকেই চরিতার্থ করতে চান। মণিভূষণের কোনো দায় ছিল না সেই চরিতার্থতার মশলা যোগানোর। এর পর তাঁর কবিতায় তাই কমে এল রাজনৈতিক ঘটনার প্রত্যক্ষ উল্লেখ। বস্তুত 'গান্ধীনগরে রাত্রি' প্রকাশিত হওয়ার অল্প কিছুদিন পরেই নকশালবাড়ির লড়াই স্তিমিত হয়ে আসে, তার সাময়িক বিপর্যয় ঘটে। সে অবস্থায় পুনরাবৃত্তির ফাঁদ এড়িয়ে, যে রাজনৈতিক বোধ তিনি অর্জন করে নিয়েছিলেন তারই ভাঙচুর চালাতে লাগলেন, সেই বোধকে যাচাই করে নিতে চাইলেন পরবর্তী কবিতাগুলিতে। তার প্রমাণ রইল 'মানুষের অধিকার' বা 'দক্ষিণ সমুদ্রের গান'-এ, বিশেষ করে দ্বিতীয় বইটিতে। এখন খুব সহজে তিনি বলতে পারেন— 'যে ফুল ফোটে সে-ফুল ফুটুক/রাজনীতিটা গোড়ার কথা।' (ভ্রমণকাহিনী/দক্ষিণ সমুদ্রের গান)। কখনও বা রামায়ণ মহাভারতের কাহিনীর আধারে ব্যক্ত করলেন নিজের বোধ ভাবনা, আর মনে করিয়ে দিলেন— 'শিল্প তো পতঙ্গ নয়, জ্বালায়, জ্বলে না।' (লৌকিক বাগান/প্রাচ্যের সন্ন্যাসী)। কখনও হয়ত তাঁকে ভর দিতে হয়েছে একটু প্রসারিত আশাবাদে, 'ঐতিহাসিক পদযাত্রা' অথবা 'বৈশাখের ফেরিওয়ালা' পেরিয়ে 'অবিচ্ছিন্ন অন্তঃপুর'-এ যখন পৌঁছন তখন হয়ত সংশয় জাগতে পারে কীভাবে আসছে তাঁর আশাবাদ! কবি উত্তরে বলতে পারেন— 'উঠে এসো ছিন্ন দেশ, বিষরাত্রি, মত্ত মহাসমুদ্রের গান,/...জাগাতে পারবে না তাকে সমষ্টিবিহীন কোনো ব্যক্তিগত গানে' (উত্থান)। এই বলা উপলব্ধির গাঢ় উচ্চারণ, বানিয়ে-তোলা কিছু নয়।

নব্বইয়ের দশকে মাঝামাঝি যে কবিতা লিখছেন কবি তাকে লাগল এক আপাত-প্রশান্তির স্পর্শ, নূতন করে এক স্নিগ্ধতা ভর করল তাঁর কবিতায়। যদিও খেয়াল করলেই বোঝা যায় এই প্রশান্তির আড়ালে থেকে গেছে যন্ত্রণা, ভিতরের আগুন ঠিকই জ্বলছে। তিনি তো আগুন ছুঁতেই চেয়েছিলেন, 'নৈশভোজ'-এ তিনি বললেন— 'সারা জীবনের জমাট আলস্য ভেঙে চুরে/পথের মাঝখানে দেখা হয়ে গেল—/আগুনের সঙ্গে।' (কথার কথা/নৈশভোজ)। আবার মনে করালেন— 'এক অন্তর্যামী ঘর্ষণের ভিতরে/সমস্ত কথা বলতে না পারার বিক্ষোভেই/মানুষ প্রথম আগুন জ্বালাতে শিখেছিল।' (গুহামানব/প্রচ্ছন্ন পরাগে)।

একথা ঠিক 'গান্ধীনগরে রাত্রি'-র স্পষ্ট উচ্চারণই পাঠককে বেশি টেনেছিল, এবং যাঁরা সেটাকেই অভ্যাসে পরিণত করে ফেলেছিলেন তারা পরবর্তীকালে একটু হতাশ হয়েছিলেন। বলতেই হয় তাঁরা কবিতার কাছে কবিতা নয়, অন্য কিছু চেয়েছিলেন। ফলে খেয়াল করেননি মণিভূষণ পাল্টাননি। আর মনে রাখতে হবে স্পষ্ট বা প্রচ্ছন্ন, প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ রাজনৈতিক উচ্চারণ যেমনই হোক, মণিভূষণ আসলে একজন আদ্যন্ত রোম্যান্টিক কবি। এই রোম্যান্টিকতাই তাঁর বিপ্লববোধকে পুষ্ট করেছে, তাই তাঁকে বাঁচিয়েছে কবিতার নাম করে শ্লোগান লেখার হাত থেকে। বিপ্লব তাঁর কাছে এক বিশাল স্বপ্ন ছিল,

রোম্যান্টিকতা বলতে তিনি চাঁদ-ফুল-তারার পুনরুক্তি বোঝেননি, বুঝেছেন তাঁর স্বপ্নের উচ্চারণ। নারীপ্রেম বা প্রকৃতিমুগ্ধতার কথা মণিভূষণ খুব কমই লিখেছেন, কিন্তু তাঁর রোম্যান্টিকতায় এক অন্য সুর বাজে।

যান্ত্রিক আশাবাদ তাঁর ছিল না, মাঝে মাঝে তাঁর কবিতায় বেজে উঠেছে বিষণ্ণতা। তাও কি এক রোম্যান্টিকতা! তবু তার ধরণ আলাদা। 'নৈশভোজ'-এর 'অসমাপ্য উত্তরমেঘ' কবিতায় লিখেছিলেন তিনি— 'বৃষ্টির প্রণিপাত শেষ হয়ে যাবার আগেই/তুমি চলে গেলে।/জলের কণ্ঠস্বর থেকে মাঝে মাঝেই তুমি/পৃথক হয়ে যাও, আর তখনই আকাশের শ্লেটে ভেসে ওঠে/কয়েকটি বিষণ্ন অঙ্ক।' বা 'মাল্যদান পর্ব শেষ হবার পর/তাদের জড়িয়ে নিয়েছিল তন্দ্রামায় রজনীর কেশগুচ্ছ।' এই বিষণ্ণতাকে ব্যাখ্যা করা যায় না, শুধু অনুভব করতে হয়। আবার এই কবিতাকেই একটু পরেই যখন তিনি বলেন— 'বাতাসের কোমল বাহুতে মাথা রেখে/তুমি কি কোথাও ঘুমিয়ে পড়েছো।/তোমার ঘুম অথবা স্নিগ্ধ মেঘলোক থেকে/একটি রুপালি নীল প্রজাপতি ঘরে এলে/আমার টেবিলঘড়ির দুটো কাঁটাই/অচল করে দিয়ে যায়,' তখন সময়কে স্তব্ধ করে দেওয়ার এই ছবি নিশ্চয়ই রোম্যান্টিকতারই উচ্চারণ, কিন্তু কী নূতন আর আলাদা তার ভাষা! মনে পড়বে সুধীন্দ্রনাথ দত্তর 'একটি কথার দ্বিধাথরথর চুড়ে/ভর করেছিল সাতটি অমরাবতী/একটি নিমেষ দাঁড়াল সরণি জুড়ে/থামিল কালের চিরচঞ্চল গতি', কিন্তু মণিভূষণ বলছেন সম্পূর্ণ অন্য ভাবে। এটাই তাঁর স্বাতন্ত্র্য, তাঁর নিজস্বতা।

একথা ঠিক সাম্প্রতিক অতীতে যখন বামফ্রন্টের স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে উত্তাল হয়ে উঠেছিল গণ-আন্দোলন, মণিভূষণ তাকে মেনে নিতে পারেননি। তাঁর বাড়িতে একদিনের আলাপচারিতায় তা বুঝেছিলাম, প্রয়াত দীপংকরদা ও আমি কিছুটা হতাশ হয়েই ফিরে এসেছিলাম তাঁর বাড়ি থেকে। দুঃখ পেয়েছিলাম, কিন্তু পরে মনে হয়েছে মণিভূষণ নিজের সঙ্গে ছলনা করেননি। তাঁর রাজনৈতিক ভাবনা আমাদের সঙ্গে মেলেনি, তিনি নিজের মতো করে বুঝেছেন পরিস্থিতিকে, নিজের বোঝার সঙ্গে আপস করে জনপ্রিয় হতে চাননি, বাজার বুঝে লেখেননি।

মনে পড়ছে কবিতার কারুকার্যেও কি নিপুণ ছিলেন তিনি। অলংকার প্রয়োগের অসীম দক্ষতায় অসামান্য প্রতিমা নির্মাণ করতে পারতেন, আবার ছন্দোময়তায় দুলিয়ে দিতে পারতেন খুব রূঢ় সত্যভাষণকেও, বিশেষ করে কলাবৃত্ত ছন্দকে যেমন খুশি ব্যবহার করেছেন তিনি। কিন্তু সে এক অন্য আলোচনার বিষয়।

ভারতীয় সংবাদপত্র ও গণতান্ত্রিক অধিকার

১০ পৃষ্ঠার পর

censorship প্রচলিত) ভারতবর্ষের সংবাদমাধ্যম অনেকটাই স্বাধীন, এ কথা মানতে হবে।

কিন্তু সংবাদ বিতরণের এই স্বাধীনতার পাশাপাশি, মালিক গোষ্ঠী সংবাদ চেপে যাওয়া (যে কথা আগে উল্লেখ করেছি) ও সংবাদ বিকৃত করার স্বাধীনতাও ভোগ করে। এর সবচেয়ে কুখ্যাত দৃষ্টান্ত— বৃহত্তর সংবাদপত্রগুলিতে বছরের পর বছর ধরে নিরীহ মুসলমান যুবকদের সন্ত্রাসবাদী বলে চিহ্নিত করা। ১৯৯২ সাল থেকে ২০১২ দিল্লীর পুলিশ দপ্তরের বিশেষ শাখা Special Cell বহু যুবককে গ্রেফতার করে 'লশকর-এ-তাইবা', 'জাইশ-এ-মহম্মদ' প্রভৃতি জঙ্গি দলের সদস্য ও সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপের অভিযোগে। খবরের কাগজগুলি পুলিশের দেওয়া বিবৃতির ওপরে আরও রং চড়িয়ে এই যুবকদের বিরুদ্ধে (এবং পরোক্ষভাবে সমগ্র মুসলমান যুবসমাজ সম্বন্ধে) এক আতঙ্কজনক সন্দেহের প্রচার জাল বিস্তৃত করে। ২০১২ সালে আদালতের বিচারে এই যুবকেরা নির্দোষ বলে প্রমাণিত হন, ও মুক্তি পান। কিন্তু তাঁদের জীবনের এই মুল্যবান সময় যে নষ্ট হল এর জন্য আমাদের রাষ্ট্রীয় প্রশাসন ছাড়াও সংবাদপত্রগুলিও কি কম দায়ী নয়? সত্য না যাচাই করে দায়িত্বজ্ঞানহীন সংবাদ বিবরণ সমাজের পক্ষে প্রচণ্ড ক্ষতিকারক এবং পাঠকসমাজের সত্য ঘটনা জানার গণতান্ত্রিক অধিকার এইভাবে লঙ্ঘিত হয়।

পিট সিগারকে নিবেদিত

অশোক চট্টোপাধ্যায়

চোখের ভেতর আকাশ আকাশ স্বপ্ন বোঝাই নদী
জোয়ার এলে দুকূল ভাঙে নিত্য নিরবধি
ভাঙতে ভাঙতে উথলে ওঠে জলের লহরি
চোখের জলে বুক-ভাসানো গানের বহর-ই

বোঝাই করে বিশাল জাহাজ প্রাণজোয়ারে ভাসে
প্রজাপতির পাখার রঙে স্বপ্নের-ই মেঘ হাসে
আকাশ জুড়ে বাতাস জুড়ে বক্ষ ভরা প্রাণ
প্রাণের মাঝি মাঝদরিয়ায় প্রাণ খুলে গায় গান

চোখের ভেতর নবীন নবীন মেঘ রোদ্দুর নাচে
জীবন বাউল গান ছাড়া বল কী নিয়ে আর বাঁচে
গান যে জীবন গান যে মরণ গান যে স্বপ্নকথা
গানের সাথে সখ্য প্রাণের যন্ত্রণা আর ব্যথার

গানের সুরে আকাশ জাগে বাতাস মেলে আঁখি
জীবন নামের আকাশ গাঙে নাও বাঁধে তিন পাখি...

কলকাতার পুকুর

অরিজিৎ

কলকাতা পুকুর কথা নামে একটি বই সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে। লেখক মোহিত রায়। অত্যন্ত প্রয়োজনীয় এই বইটি থেকে উপাদান সংগ্রহ করে বর্তমান লেখাটি তৈরি হয়েছে কলকাতার পুকুর, তার ইতিহাস, জনজীবনে তার ভূমিকা, পুকুর-জলাশয় নিয়ে নানা আন্দোলনের ওপর। সঠিক অর্থে পুস্তক সমালোচনা না হলেও লেখাটির ছত্রে ছত্রে ঐ পুস্তকটির উপস্থিতি স্বীকার্য।

আমাদের পরিবেশের অজৈব উপাদানগুলোর মধ্যে পুকুর খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কেবল জলের উৎস হিসেবেই নয়, পুকুরের গুরুত্ব আরো অনেক বেশি। শহরাঞ্চলে পুকুরগুলোই ঘনবসতিপূর্ণ পাড়ায় একমাত্র বড় ফাঁকা জায়গা। জলের বহুমুখী চাহিদা তো মেটায়ই পুকুরগুলো— স্নান করা, কাপড় কাচা, বাসন মাজা, সব। মূলত যারা গ্রাম থেকে শহরে কাজে আসে, শহরে স্থায়ী আস্তানা যাদের নেই, কিংবা শহুরে বস্তিতে যারা থাকে, শহরের পাইপ লাইনের জলের সুবিধে থেকে তারা অনেকাংশেই বঞ্চিত; এরাই অনেকাংশে জলের জন্য নির্ভর করে পুকুরের ওপর। বাণিজ্যিকভাবে কিংবা বাণিজ্যিকভাবে না হলেও পুকুরের মাছের কারবারের ওপর অনেকের জীবিকা নির্ভর করে। পুকুরে জল, পাড় সংলগ্ন গাছপালায় বসবাসকারী নানাবিধ প্রাণী, উদ্ভিদ মিলিয়ে সম্ভবত শহরের সর্বোৎকৃষ্ট জৈববৈচিত্র্য দেখা যায়। অনেকাংশে নিকাশি ব্যবস্থাও নিয়ন্ত্রিত হয় পুকুরগুলো দিয়ে। মাটির নীচের জলস্তর পুষ্ট করে এরা। ধর্ম আর ঐতিহ্যের সাথে জুড়ে থাকা পুকুরগুলো অনেক সময় মানুষে মানুষে মেলবন্ধনের ক্ষেত্র হয়ে ওঠে।

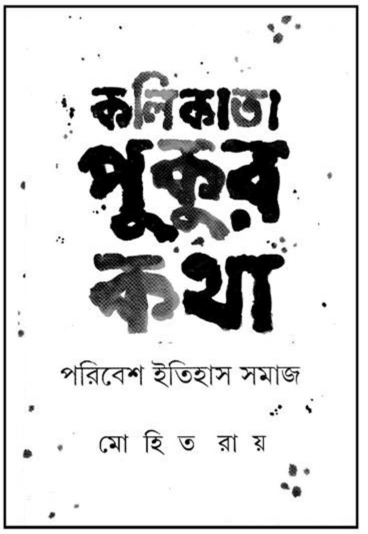

পশ্চিমবঙ্গ ফিসারিজ এ্যাক্ট ১৯৮৪ অনুযায়ী পুকুরের ন্যূনতম আয়তন ০.০৩৫ হেক্টর। পূর্ব কলকাতার জলাভূমি সহ কলকাতায় মানুষের খনন করা দুটি বড় সরোবর (রবীন্দ্র সরোবর ও সুভাষ সরোবর) আর অন্তত পাঁচ হাজার ছোট-বড় পুকুর নিয়ে শহর কলকাতার এই অবহেলিত জলসম্পদ গঠিত। এদের অনেকেরই বয়স শহর কলকাতার গড়ে ওঠার ইতিহাসের চেয়ে বেশি। কলকাতা গড়ে ওঠার প্রাক্কালে তার রূপটা গ্রাম-বাংলার মতই ছিল। ইতস্তত কিছু গ্রাম আর ধানখেত। শহরের বৃদ্ধির সাথে সাথে ধানজমির মাটি কেটে পুকুর বানিয়ে বাস্তুভিটে বানানো হয়েছে। তাই প্রায় বাড়ির সাথে সাথেই সে যুগে একটা করে ছোট হলেও পুকুর ছিল। স্নান, কাপড় কাচা, বাসন মাজা তো বটেই, পানীয় জলেরও একমাত্র উৎস ছিল এই পুকুরগুলো। ১৯০৭ সালে টালার ট্যাঙ্ক ও কলকাতায় বাড়ীতে বাড়ীতে পাইপ লাইনে পরিশ্রুত জলের ব্যবস্থা হলে পুকুরগুলো খানিকটা অপ্রয়োজনীয় হয়ে পড়ে আর তার সাথে শহরে ক্রমবর্ধমান মানুষের চাপে জমির মূল্য বৃদ্ধি পেতে থাকে; রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে পুকুরগুলো অপরিষ্কার হয়ে ওঠে, আর সেই এঁদো পুকুরগুলো মশা আর ম্যালেরিয়ার আঁতুড়ঘর হয়ে উঠতে থাকে। ফলে পুকুর বুজিয়ে ফেলার প্রক্রিয়া শুরু হয়। গত দুই-তিন দশকে পুকুর বুজিয়ে ফেলার গতি বেড়ে গেছে ভয়ানক দ্রুততায়, সঙ্গে সঙ্গে তার রূপও। জমি-বাড়ির ব্যবসার রমরমা আর প্রমোটারির চক্করে পড়ে নতুন জমি পাওয়ার এক গুরুত্বপূর্ণ পন্থা হয়ে উঠল পুকুর ভরাট। ১৯৯৪ সালে পুকুর ভরাট প্রতিরোধে আইন হলেও তার পরেও পুকুর ভরাট অব্যাহত— কেননা কলকাতার পুকুরের সংখ্যা ও মান সংক্রান্ত কোনো তথ্য কিংবা পরিপূর্ণ পরিকল্পনা রাজ্য সরকার কিংবা কর্পোরেশনের হাতে আজও নেই। ছোট পুকুরগুলি সহজে দূষিত হয়ে যায়। বাড়ীর আবর্জনা ফেলা হতে থাকে। মালিকরাও সেটাই চায় অনেক সময়। ধীর পদ্ধতিতে ক্রমশ ভরাট হতে থাকে পুকুর। বিগত দশক দুটিতে পুকুর ভরাট ও পরিবেশ সংক্রান্ত বড়োসড়ো নাগরিক আন্দোলনগুলো সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষগুলোকে নাড়িয়ে-চাড়িয়ে বসিয়েছে বটে কিন্তু কাজের কাজ কিছু হয়নি।

কলকাতার পুকুরগুলো মূলত ব্যক্তি মালিকানার হলেও জলের অধিকার কিন্তু বরাবর সাধারণের অধিকার হিসেবেই স্বীকৃত ছিল। এমনকি প্রাকৃতিকভাবে বেড়ে ওঠা মাছের ওপরও

সাধারণের খণ্ডিত অধিকার ছিল। ছিপ বা বর্শা দিয়ে মাছ ধরাটা খুব একটা আপত্তির ছিল না কোনোকালেই। কিন্তু বর্তমানে বাণিজ্যিক মাছ চাষ মাছের ওপর সাধারণ জনগণের অধিকারকে খর্বিত করলেও শহর কলকাতায় বিশুদ্ধ ব্যক্তি মালিকানার যুগেও পুকুরগুলো এখনও খানিকটা সাধারণের সম্পত্তির চিহ্ন বহন করে চলেছে।

ভূসম্পদের ক্রমবর্ধমান মূল্য আর প্রমোটারির হাতছানিতে ব্যক্তি মালিকানাধীন বহু পুকুরই ভরাট হয়ে গেছে, খর্বিত হয়েছে মানুষের যৌথ ভোগের অধিকার। বনেদি কলকাতায় এই সংখ্যা হ্রাসটা নবীন কলকাতার (১০১-১৪১ নং ওয়ার্ড) তুলনায় অনেক বেশী। বাগবাজার, শোভাবাজার, শ্যামবাজার অঞ্চলে ১৯১১ সালে ছিল ৪৭টি পুকুর আর ১৯৬১-র সমীক্ষায় কমতে কমতে দাঁড়িয়েছে একমাত্র হেদুয়া। বনেদি দক্ষিণ কলকাতার ভবানীপুরে ১৯৮৮-র সমীক্ষায় যে সংখ্যাটা ছিল ৮২৬, সেটাই ১৯৬১ সালে দাঁড়ায় ৩৩-এ আর আজ সংখ্যাটা শূন্য।

গঙ্গার পাড়ে অবস্থিতির জন্য শহর কলকাতার সরবরাহের জল পর্যাপ্ত। মাথাপিছু জলের হিসাবটা গালভরা হলেও জলের বেশীরভাগটা খরচ হয় শহরের বাজার, বাণিজ্যিক সংস্থায় আর কারখানায়। আর যে ৪০ শতাংশ মানুষের স্থায়ী আস্তানা নেই স্বাভাবিকভাবেই তারা বঞ্চিত কলের জলে। অগত্যা তাদের নির্ভর করতে হয় দিনে কয়েক ঘণ্টার পাড়ার রাস্তার পাশের সরবরাহের কল কিংবা গঙ্গাজলের কলের উপর। রাস্তার পাশে বসে কাপড় কাচা, কিংবা বেআব্রু হয়ে গণস্নান। কিন্তু যেখানে পুকুর আছে সেখানে দৃশ্যটা আলাদা। অবশ্য শহরের একদম ছোট মাপের পুকুরগুলো অতিরিক্ত ব্যবহারের ফলে তাড়াতাড়ি দূষিত হয়ে যায়, ফলে এগুলো আর জলের উৎস হিসেবে ব্যবহৃত হয় না, বরং ব্যবহার হয় আঁস্তাকুড় হিসেবেই।

একটি পরিবেশ সংগঠনের নিরলস সমীক্ষা থেকে দেখা যাচ্ছে স্নান, বাসন মাজা, কাপড় কাচার জন্য শহরের পুকুরের ওপর নির্ভর করেন অন্তত দশ লক্ষ মানুষ। ৭১টি নির্বাচিত পুকুরে ব্যবহারকারীদের মধ্যে পুরুষ স্নানার্থী ৫৫ শতাংশ, মহিলা স্নানার্থী ১৬ শতাংশ আর শিশু স্নানার্থী ১২ শতাংশ, অর্থাৎ ৮৩ শতাংশ ব্যবহারকারীই স্নানের জন্য পুকুর ব্যবহার করেন। লক্ষণীয় ব্যাপার, স্নানার্থীদের সিংহভাগ পুরুষ, আর বাসন মাজা, কাপড় কাচার রাজটি মূলত মহিলারাই করেন। আরো বিস্তারিত বললে বলা যায়, স্নানার্থী পুরুষদের বেশির ভাগই কর্মসূত্রে কলকাতার বাসিন্দা, বিশেষত দোকানের কর্মচারী, রিক্সা-ভ্যান চালক ইত্যাদি, আর এই মহিলাদের বেশীরভাগই শহরে থাকেন না, গৃহপরিচারিকা হিসেবে রোজ শহরে আসেন। ফলে তাদের মারফত শহরের স্থায়ী অবস্থাপন্ন বাসিন্দারা অনেকেই পুকুরের জলের ওপর নির্ভরশীল। আরো দেখা গেছে, পুকুর ব্যবহারকারীদের ৭৭ শতাংশ আসে দরিদ্র পরিবার থেকে। জাতির নিরিখে তপসিলি জাতির মানুষ মোট ব্যবহারকারীর ৩০ শতাংশ, যেখানে কোলকাতার জনসংখ্যার মাত্র ৬ শতাংশ মানুষ তপসিলি জাতিভুক্ত।

পুকুরের অন্যতম ব্যবহার মাছ চাষ। প্রমোটারী রমরমার প্রথম পর্বে যারা পুকুর ভরাট না করে ফেলে রেখে দিয়েছিল ভবিষ্যতের জন্য, ১৯৯৪-এ পুকুর ভরাট রদ সংক্রান্ত আইনে তাদের সে আশা পূরণের পথ আটকে গেছে। সঙ্গে বাড়তি সমস্যা হয়েছে— পুকুর রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিষ্কার রাখার অর্থনৈতিক দায় এসে পড়েছে পুকুর-মালিকদের ঘাড়ে। এর জন্য কোনোরকম সরকারি সাহায্য বা ভর্তুকি পাওয়া যায় না। পুকুরের জল থেকে বাণিজ্যিকভাবে আয় হতে পারে মাছ চাষ থেকে। মাছ চাষের জন্য নিয়মিত আগাছা, কচুরিপানা কিংবা অবাঞ্ছিত ময়লা পরিষ্কার করতে হয়। সুতরাং শহরের পুকুরের অবস্থার অন্যতম নির্ণায়ক মাছ চাষ। যদিও মাছ চাষের জন্য মহুয়া খোলের অত্যধিক ব্যবহার, সস্তার মাছের খাবার, মাত্রাতিরিক্ত রাসায়নিকের প্রয়োগ এবং শৌচাগারের জৈব বর্জ্য মাছের খাদ্য হিসেবে ব্যবহারের জন্য অনেক ক্ষেত্রেই সেই জল নাগরিক ব্যবহারের অযোগ্য হয়ে পড়ে। মাছের বৃদ্ধি বা জলের মান ইত্যাদি সংক্রান্ত বিষয়বস্তু পড়ানোর কলেজ কিংবা গবেষণার জন্য বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠান এমনকি সরকারের মৎস্য দফতর থাকলেও কলকাতার সহস্রাধিক পুকুরে মাছ চাষ হয় জেলেদের প্রচলিত বিদ্যার ওপর নির্ভর করে। পুকুরের সাথে সম্পর্কিত এই মৎস্যজীবী সম্প্রদায় কলকাতার নাগরিক। কলকাতার পত্তনের সাথে সাথেই হুগলী, মেদিনীপুরের জেলে-কৈবর্তদের বসবাস শুরু হয় কলকাতার শিয়ালদহ, নেবুতলা, শাঁখারীটোলা অঞ্চলে, পরবর্তীকালে যা জেলেপাড়া নামে পরিচিত হয়। বাংলার সংস্কৃতির একটি বিশেষ ধারার সাথে এদের নাম যুক্ত হয়ে আছে। বর্তমানে মাছ ধরার পেশার সাথে যুক্ত একটা বড় অংশ প্রতিবেশী রাজ্য উড়িষ্যার বাসিন্দা। কলকাতার নানান জায়গায় অস্থায়ী আবাস তৈরি করে ঠাসাঠাসিভাবে অত্যন্ত অস্বস্তিকর পরিবেশে বসবাস করে এরা— পরিবার থাকে দেশে। বেহালা, সরশুনা, পাটুলি কিংবা মুদিয়ালী অঞ্চলের জেলেরা নিজেদের সমবায় সমিতি তৈরি করলেও বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই এরা যেহেতু কোনো নির্দিষ্ট পুকুর বা জলাশয়ের সাথে যুক্ত নয় তাই তাদের কোনো সমবায় নেই। সামাজিক সুরক্ষার নিরিখে এই শ্রমজীবী সম্প্রদায় একেবারেই প্রান্তিক, অথচ এরাই শহর কলকাতার বেশীরভাগ মানুষের প্রোটিনের সর্বাধিক জনপ্রিয় উৎসটির যোগানদাতা, কলকাতার পুকুরগুলোর রক্ষক।

পুকুরের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়বস্তু হলো জলের মান। সচেতনার অভাবে আর অভ্যাসে (ধর্মীয় রীতিও বটে) বর্জ্য/আবর্জনা পুকুরে ফেলার রীতি আছে। এমনকি পাড়ার

ভ্যাটগুলোও কাণ্ডজ্ঞানহীনভাবে পুকুরপাড়ে তৈরি করা হয় বহু জায়গায়। নিয়মিত পরিষ্কার করার অভাবে ভ্যাট উপচে ময়লা ফেলার জায়গা হয়ে যায় পুকুর। অপরিষ্কার পুকুর আরো মানুষকে আবর্জনা ফেলতে আকর্ষণ করে। অভিজ্ঞতা বলছে, পরিষ্কার পুকুরে সাধারণভাবে মানুষ ময়লা ফেলে না। তার ওপর আছে কচুরীপানার নিয়মিত বৃদ্ধি আর স্বল্প খরচে মাছ চাষের জন্য জলের দূষণ। শহরের রাস্তা, পার্ক যেমন কর্পোরেশন নিয়মিত পরিষ্কার করে তেমনই সমস্ত রকম জলাশয় (সরকারি, ব্যক্তিমালিকানার বা কমিটির) নিয়মিত পরিষ্কারের দায়িত্ব যদি কর্পোরেশন নেয় তাহলে জলের মান ঠিক রাখা সম্ভব। নিয়মিত ডিটারজেন্ট সহযোগে কাপড় কাচায় রাসায়নিক দূষণ, ব্যাপক পরিমাণে প্লাস্টিক পুকুরে ফেলা, গাড়ী ধোয়া কিংবা গোরু-মোষ স্নান করানো এসবও পুকুরের দূষণের কারণ। এগুলি নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে জলের দ্রবীভূত ও ভাসমান নানান উপাদানের সমতা রক্ষা করা যায়, নিয়ন্ত্রণ করা যায় অম্ল-ক্ষারের ভারসাম্য, দ্রবীভূত অক্সিজেনের পরিমাণ কিংবা সীসা, দস্তা, ফসফেট, নাইট্রেটের মত ধাতব ও মূলকগুলি।

পুকুরের আর একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় তার বাস্তুতন্ত্র। জলের মানের সাথে এর সম্পর্কটি দ্বান্দ্বিক। স্বাভাবিক প্রাকৃতিক পরিশোধনে যেমন এদের ভূমিকা আছে, তেমনই জলের মানের ওপর বাস্তুতন্ত্রের উপাদানগুলি কোনটা বাড়বে বা কমবে তা ঠিক হয়। ঢালু পাড় ও জলের সংযোগস্থলের বিশেষ স্যাঁতস্যাঁতে পরিবেশ, জল ও বাতাস উভয়েই উপস্থিতির জন্য প্রচুর ধরনের প্রাণী ও উদ্ভিদ এখানে থাকে। অথচ পাড়ের ভাঙন ঠেকাতে অবিবেচকের মত কংক্রিট দিয়ে পাড় বাঁধিয়ে সেই জৈববৈচিত্র্যকে আমরা ধ্বংস করছি। পুকুর কেবল মাছচাষের জন্য নয়, পুকুর কেবল গরিব শহরবাসীর জলের যোগানদার নয়, পুকুর শুধু বিনোদন বা নান্দনিক বিষয়বস্তু নয়, পুকুর শুধু শ্বাসরোধ করা শহরে একটু উন্মুক্ত প্রান্তর বা মুক্ত বাতাস নয়। পুকুরের জল, পুকুর পাড়, পুকুর পার্শ্বস্থ গাছপালা যে বহু রকমের জীবন্ত উপাদানের আশ্রয়স্থল সে কথা আমরা অনেক সময়ই ভুলে যাই। পৃথিবীতে মানুষের টিকে থাকাটা সুরক্ষিত হয় অন্যান্য প্রাণী ও উদ্ভিদের স্বাচ্ছন্দ্যে টিকে থাকার মাধ্যমেই।

গত শতকের আশির দশক থেকেই পরিবেশ বিষয়টি নতুন করে আলোচ্য বিষয়বস্তু হয়ে উঠতে শুরু করে। বিশ্ব জুড়ে পরিবেশ নিয়ে ক্রমবর্ধমান আলোচনা, টিভি-রেডিওতে প্রচার, পরিবেশ সংক্রান্ত আইন তৈরি হওয়া, পাঠ্যক্রমে পরিবেশ বিষয়ের অন্তর্ভুক্তি এবং তার সাথে মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানিগুলোর অর্থে পুষ্ট এনজিও-দের গজিয়ে ওঠা একটা প্রভাব ফেলে পরিবেশ সচেতনতা বৃদ্ধিতে। আর কলকাতায় তা প্রতিফলিত হয়েছে পুকুর সংক্রান্ত নানান নাগরিক আন্দোলনে। যাদবপুরে বিবেকনগর ঝিল সংক্রান্ত নাগরিক উদ্যোগ বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। এলাকার মধ্যবিত্ত নাগরিকরাই যখন (১৯৯৯) দীর্ঘদিনের জমা আবর্জনা আর কচুরিপানা পরিষ্কারে নামলেন, সংবাদমাধ্যম মারফত এ ঘটনা সমাজে আলোড়ন তৈরি করল। অচিরেই সরকার দায়িত্ব নিল। এলাকার মানুষ আর সরকারের যৌথ উদ্যোগে এক বছরের টানা কার্যক্রমে ঝিলটি ব্যবহারযোগ্য হয়ে ওঠে। জৈববৈচিত্র্যের ক্ষতি না করে চারদিকে শক্ত করে বাঁধানো ঘাট তৈরি হয়, আশপাশে গাছ পুঁতে সৌন্দর্যায়নেরও ব্যবস্থা হয়। পুকুরপাড়ে তৈরি হওয়া বস্তির পরিবারগুলিতে শহর কলকাতায় উপযুক্ত পুনর্বাসন দেওয়ার ব্যাপারটিও এই সংস্কারের সাথে যুক্ত। সাধারণ মানুষের স্নানের অধিকার, বেশি লাভের জন্য মাছ চাষে রাসায়নিকের যথেচ্ছ ব্যবহারকে নিয়ন্ত্রণ করে, এমনকি ধর্মীয় ভাবালুতার সাথে যুক্ত প্রতিমা বিসর্জনের ব্যাপারটিকেও ধর্তব্যের মধ্যে রেখে একরকমের মডেল তৈরি করেছে পুকুর পরিচালন কমিটি।

একটি নাগরিক আন্দোলন চলেছে বিক্রমগড় ঝিল ভরাট নিয়ে। গত দশকের শুরু থেকে ঝিলটি রক্ষা নিয়ে নানান কর্মসূচি চলছিল। ২০০২ সালে ঝিলের পাশে অবস্থিত দীর্ঘ দিন বন্ধ থাকা জয় ইঞ্জিনিয়ারিং কারখানার জমি কিনে সাউথ সিটি নির্মাণের কাজ শুরু হয়। বিশালাকৃতির চারটি আবাসনের দুটি আবাসন নির্মাণ শুরু হয় ঝিলটির একাংশ ভরাট করে। ২০০৬ সালের জানুয়ারিতে এ সংক্রান্ত রিপোর্ট দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদসহ নানান জায়গায় পাঠানো হলে পর্ষদ একটি শুনানির ব্যবস্থা করে এবং একটি কমিটিও বানায়, যে কমিটি মে মাসে রায় দেয় টাওয়ার দুটি ভেঙে ফেলার পক্ষে। নির্মাণকার্য কিন্তু তার পরেও চলতে থাকে। সাউথ সিটি নির্মাণের ব্যাপারে তৎকালীন মেয়র (তৃণমূল) এবং রাজ্য সরকার (বামফ্রন্ট) যে বাধা দেবে না এ ব্যাপারে নিশ্চিত ছিল একাধিক প্রমোটারের যৌথ সংস্থাটি। অবশেষে নানান টালবাহানার পরে ঐ বছরেই ডিসেম্বরে মামলাটি খারিজ হয়ে যায়, মামলাটি দেরি করে শুরু করা হয়েছে এই অজুহাতে। পরিবেশকেন্দ্রিক একটি নাগরিক আন্দোলন ব্যর্থ হল টাকার শাসনের কাছে; জয়ী হল প্রকৃতির বুকে বসে টুটি টিপে ধরার সংস্কৃতি।

অন্য আর একটি ঘটনা আবর্তিত হয়েছে রবীন্দ্র সরোবরকে কেন্দ্র করে। মানুষের ব্যবহারে সরোবরের জল ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে এই অজুহাতে পরিবেশবিদ সুভাষ দত্তের নেতৃত্বে হাওড়া গণতান্ত্রিক নাগরিক সমিতি সহ আরো কয়েকটি পরিবেশ সংগঠন মামলা করে এবং অভিযোগের অভিমুখ থাকে শিয়ালদহ-বজবজ রেললাইনের পার্শ্বস্থ বস্তি গোবিন্দপুর কলোনির বাসিন্দাদের দিকে। ভারতীয় রেল এই মামলার অংশ হয়ে পড়ে। উচ্চ আদালত বস্তিতে স্নান ও শৌচালয়ের ব্যবস্থা করার, আর তার খরচ রেল ও রাজ্য সরকারকে বহন করার রায় দেয়। রেল তাতে রাজি না হয়ে ঐ দশ হাজার পরিবারকে

উচ্ছেদের আবেদন নিয়ে যায় উচ্চ আদালতে। উচ্ছেদের পক্ষে রায় বেরোলে ২০০২ থেকে উচ্ছেদের বিপক্ষে সরব হয় সচেতন নাগরিক সমাজ। আন্দোলনের চাপে তখন কার্যত উচ্ছেদ কার্যকর হয় না। ২০০৪ সালে সুভাষ দত্ত আবার আদালতে উচ্ছেদের জন্য আবেদন জানান। একটি পরিবেশ আন্দোলন বিশুদ্ধভাবে পরিবেশ রক্ষার তাগিদে উচ্ছেদের মত অমানবিক পদক্ষেপ নেয়। এর বিরোধিতায় বহু গণসংগঠন, পরিবেশ সংগঠনের যৌথ আন্দোলনের চাপে নোনাডাঙ্গায় পুনর্বাসনের প্রতিশ্রুতির মাধ্যমে এই অধ্যায়ের সমাপ্তি ঘটে। অথচ স্নান, শৌচালয়ের বিকল্প ব্যবস্থা করলেই হতো, এত মানুষকে উচ্ছেদ করে বিপাকে ফেলার কোনো প্রয়োজন ছিল না। এর পর যদিও এক দশক হতে চলল, রবীন্দ্র সরোবর কিন্তু একইরকম অপরিষ্কার রয়ে গেছে। পরিবেশকে রক্ষা করার থেকেও পরিবেশ আন্দোলনের নামে কলকাতাকে ঝাঁ-চকচকে বানানোর আর তার জন্য গরিব হঠাও-এর দর্শনে চালিত হচ্ছে একটি ধারার পরিবেশ আন্দোলন। এ ধারাটি মোটেও পরিবেশ বান্ধব নয়। বলতে দ্বিধা নেই, এটি একটি ক্ষতিকর ধারা।

বিগত দশকগুলিতে ক্রমবর্ধমান পরিবেশ নিয়ে সচেতনতা আর কর্মকাণ্ড কোনোভাবেই শ্রেণী রাজনীতির উর্দ্ধে নয়। সংবাদমাধ্যম, এনজিও আর সরকারি কার্যক্রম সবকিছুই উচ্চ ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মতো করেই পরিবেশ আন্দোলনের রূপরেখা তৈরি করে। পরিবেশ সংক্রান্ত কমিটিগুলিতে কোথাও যে খেটে খাওয়া মানুষের প্রতিনিধিত্ব নেই সে কথা বলাই বাহুল্য। শহর কলকাতার জলাভূমি নিয়ে আন্দোলনও সেই দোষে দুষ্ট। শহরের ঘিঞ্জি পরিবেশে জলাশয়ের নীল জল যেমন মধ্যবিত্তের কাছে উন্মুক্ত একফালি জায়গার আশ্বাস, তেমনই তা নিম্নবিত্তের জীবনযাপনের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। একদিকে নান্দনিকতা, আর অন্যদিকে টিকে থাকার লড়াই। এমতাবস্থায় যখন জলাভূমি রক্ষা বা সংস্কারের আন্দোলনের রাশ এলাকার মধ্যবিত্ত ও স্থায়ী বাসিন্দাদের হাতে তখন অন্য দিকটা যে অবহেলিত হবে এটা স্বাভাবিক। দূষিত খাল, জঞ্জাল, ঘিঞ্জি বস্তি যেমন পরিবেশগতভাবে অস্বাস্থ্যকর, তেমনই বর্তমান অর্থনৈতিক কাঠামোয় পরিবেশের অজুহাতে বাসিন্দাদের জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা না করে এগুলির অপসারণও অনৈতিক। ফলে জলাশয়ের ভদ্রলোকী আন্দোলনে খেটে-খাওয়া মানুষের পুকুরের নানান মানবিক ব্যবহার ধর্তব্যের বাইরে থেকে যায়; পরিবেশ মূল্য আরোপিত হয়ে সাধারণের ব্যবহার মূল্য খর্বিত হয়। ফলে আন্দোলনের ও সংস্কারের একটা স্তরের পরে গণতান্ত্রিক পুকুর কমিটিগুলোও পুকুরের সাথে দৈনন্দিন প্রয়োজনে যারা যুক্ত তাদের প্রতিনিধিত্বের ব্যাপারে তেমন মাথা ঘামায় না। পুকুরে স্নান, কাপড় কাচা, বাসনমাজার মত ব্যাপারে বিধিনিষেধের পথে হাঁটে। জলাভূমি পরিষ্কার রেখে পরিবেশ উন্নয়নের খাতে সরকারি বা বেসরকারি অনুদান পাওয়ার পেছনে দৌড় বেড়েছে; অনুদানের টাকায় স্নানের ঘাট সারানোর, জলের মান ভালো করার বদলে পাড়ের সৌন্দর্যায়নের কার্যক্রম নেওয়া হয়েছে। লাভজনক মাছ চাষের দিকে বেশি করে ঝোঁকা হচ্ছে যা জলকে স্নানের উপযোগী রাখে না; আর সর্বোপরি যে লক্ষণটি দেখা যাচ্ছে তা হলো পুকুর থেকে প্রাপ্ত অর্থ দিয়ে সংলগ্ন অঞ্চলে ভদ্রলোকের বাচ্চাদের জন্য সুইমিং পুল বানানো কিংবা গোটা পুকুরটাকেই ভালো করে বাঁধিয়ে চকচকে সুইমিং পুলে পরিণত করা। এ ব্যাপারে কোনো সুষ্ঠু পরিকল্পনা নেয়নি সরকার, সংসদীয় দলগুলোও এ ব্যাপারে উদাসীন— বলা ভালো, স্থানীয় উচ্চবর্গের আকাঙ্ক্ষা আর স্বার্থের লেজুড়বৃত্তি করে চলেছে তারা।

জলাভূমিকে প্রকৃত অর্থে রক্ষা করার রূপরেখা যদি তৈরি না করা যায়, তাহলে কোনো বিচ্ছিন্ন কার্যক্রম কোনো সমাধানের দিশা নিয়ে হাজির হবে না, যা আরো হাজারো পুকুর রক্ষার আন্দোলনের জন্ম দিতে পারে।

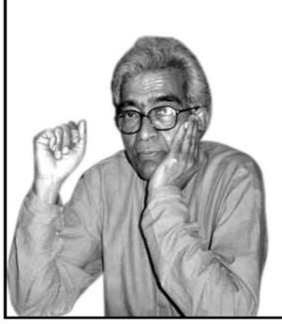

প্রকাশিত হলো

দীপংকর চক্রবর্তী : নির্বাচিত রচনা (১ম খণ্ড)

২০০৲

দীপংকর চক্রবর্তীর রাজনৈতিক লেখাগুলির একটি সংকলন

pbs

পিপলস বুক সোসাইটি

১০/২বি, রমানাথ মজুমদার স্ট্রিট (দ্বিতল)

গ্রন্থ সমালোচনা

মুর্শিদাবাদ : এক আঞ্চলিক ইতিহাস

দেবরাজ চক্রবর্তী

ইতিহাসে 'মুর্শিদাবাদের' স্থান কিছুটা স্বতন্ত্র, কারণ আঞ্চলিক ইতিহাস চর্চার ধারা এই একটি নির্দিষ্ট জনপদকে কেন্দ্র করে বহুমাত্রিক রূপ ধারণ করেছে। 'মুর্শিদাবাদ'— সে অর্থে অষ্টাদশ শতকের একেবারে গোড়ার দিকে গড়ে ওঠা রাজধানী শহর; আবার ঔপনিবেশিক শাসনের সুবাদে জেলা হয়ে ওঠে, সুতরাং মুর্শিদাবাদ যদি আঞ্চলিক ইতিহাসচর্চার বিষয় হয় তাহলে প্রথমত শহর মুর্শিদাবাদ এবং দ্বিতীয়ত জেলা মুর্শিদাবাদের দিকে দৃষ্টি প্রদানের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। মুর্শিদাবাদের ইতিহাস বলতে কতকগুলি বিষয় সামনে উঠে আসে যেমন : মুর্শিদকুলি খাঁ, সিরাজউদ্ দৌল্লা, মীরজাফর, পলাশীর যুদ্ধ ও ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের ভিত্তিস্থাপনের মতো বিষয়। এবিষয়ে একাধিক গবেষণা উনবিংশ শতকের মাঝামাঝি সময় থেকেই বিকাশলাভ করতে থাকে। এক্ষেত্রে ১৮৫৯-এ বহরমপুর শহর থেকে প্রকাশিত শ্যামধন মুখোপাধ্যায় রচিত 'মুরশিদাবাদের ইতিহাস' ছিল মুর্শিদাবাদ শহর সম্পর্কিত ইতিহাস রচনার প্রাথমিক প্রয়াস। যেখানে অষ্টাদশ শতকেও বাংলার ইতিহাস রচিত হয়েছে, যেখানে মুর্শিদাবাদকে কেবলমাত্র রাজনৈতিক শক্তি আবর্তনের কেন্দ্র হিসাবে উপস্থাপন করা হয়েছে। কিন্তু আঞ্চলিক ইতিহাস কেবলমাত্র রাজনৈতিক ঘটনাবলীর মধ্যেই আবদ্ধ থাকে না; বরং সাধারণের দৈনন্দিন জীবনচর্চা, অর্থনীতি, শিল্প, জীবিকা প্রভৃতি বিষয় অনেক ক্ষেত্রেই গুরুত্বলাভ করেছে এবং আলোচনার বিষয়বস্তু হয়ে উঠেছে। সে অর্থে বাংলার নবাবি শাসনপর্ব অনেকটাই সংক্ষিপ্ত; মাত্র পঞ্চাশ বছরের। কিন্তু স্বল্পকালীন শাসনেও বাংলার নবাবি শাসন ঘটনাবহুল এবং বিষয়বৈচিত্র্যে ভরপুর। সুতরাং পরবর্তী সময়েও মুর্শিদাবাদকে কেন্দ্র করে ইতিহাসচর্চার যে ধারা গড়ে উঠেছিল, তা মূলত নবাবি আমলকে কেন্দ্র করে। বিংশ শতকের একেবারে প্রথমদিকে (১৯০১-১৯০৫) ক্রমান্বয়ে প্রকাশিত কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়, নিখিলনাথ রায়, টুল্ ওয়ালস এবং পূর্ণচন্দ্র মজুমদারের রচনা, এমনকি অতিসাম্প্রতিক কালে সৈয়দ মহম্মদ রেজা আলি খানের রচনাতেও বাংলার নবাব-নাজিম সম্পর্কিত বিবরণ যত বেশি বর্ণিত হয়েছে, সেভাবে সমকালীন সাধারণের জীবনযাত্রার চিত্র পরিস্ফুট হয় নি। মুর্শিদাবাদের ইতিহাস অনুসন্ধানের ক্ষেত্রে সাম্প্রতিক সংযোজন রেজী জোনস ও নীতা দাস সম্পাদিত *মুর্শিদাবাদ দ্য ফরগটন ক্যাপিটাল অফ বেঙ্গল।* যদিও এই গ্রন্থটিরও প্রধান উপজীব্য বিষয় হল মুর্শিদাবাদ শহর, যা নবাবি রাজধানী ছিল।

তবে মুর্শিদাবাদের বলতে ইতিহাস কি কেবলমাত্র অষ্টাদশ শতকের গোড়ার দিকে গড়ে ওঠা একটি শহর-কেন্দ্রিক ইতিহাসকেই বোঝায়? এই প্রশ্ন বড়ো হয়ে দেখা দেয় বিগত শতকের ষাটের দশকে, যখন প্রত্নতাত্ত্বিক উৎখননে মুর্শিদাবাদ জেলার প্রাচীন ইতিহাস সামনে আসতে থাকে। সাম্প্রতিক গবেষণাসমূহের মধ্যে বিজয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'মুর্শিদাবাদের পুরাসম্পদ' নামক গ্রন্থটি এবিষয় সম্পর্কে বিস্তৃত তথ্য প্রদানে সক্ষম। সাম্প্রতিক কালে মুর্শিদাবাদ বিষয়ক গবেষণা বিভিন্ন আঙ্গিকে বিস্তারলাভ করেছে। একদিকে এদেশীয় গবেষকরা, যেমন শক্তিনাথ ঝা, পুলকেন্দু সিংহ, সৌমেন্দ্র কুমার গুপ্ত, বিষান গুপ্ত, আবুল হাসনাৎ প্রভৃতিরা, জেলার সামগ্রিক সমাজ-সংস্কৃতি, লোকসংস্কৃতি, প্রাচীন ইতিহাস কিংবা প্রাক্-স্বাধীনতা পর্বে রাজনৈতিক ঘটনাবলীর বিশ্লেষণ করেছেন; তেমনি বিদেশি গবেষকগণ জেলার স্থাপত্য ও হস্তশিল্পের প্রতি দৃষ্টি প্রদান করেছেন। মুর্শিদাবাদ বিষয়ক এই বিস্তৃত চর্চার ক্ষেত্রে সৌমেন্দ্র কুমার গুপ্তের 'মুর্শিদাবাদ ঃ দুয়ার হতে দূরে', যা মূলত এক রচনা সংকলন, এক অনবদ্য সংযোজন, যদিও অধ্যাপক গুপ্তের পূর্ববর্তী গবেষণালব্ধ গ্রন্থ 'চেনা মুর্শিদাবাদ অচেনা ইতিবৃত্ত' (১৯৯৬) ছিল জেলার ইতিহাস সম্পর্কিত তথ্যবহুল রচনা।

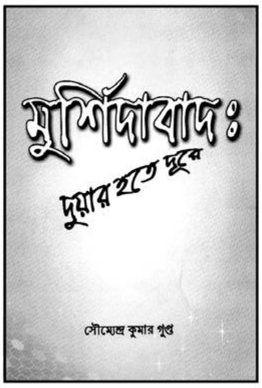

'মুর্শিদাবাদ ঃ দুয়ার হতে দূরে' মূলত অধ্যাপক গুপ্তের দীর্ঘ গবেষণার ফসল; কারণ গ্রন্থটির নিবেদনে গ্রন্থকার নিজেই বলেছেন যে, '১৯৮৬ সাল থেকে ২০১০ সাল পর্যন্ত প্রায় পঁচিশ বছরে নানা সময়ে লেখা কয়েকটি প্রবন্ধ এখানে উপস্থাপিত করলাম'। সুতরাং যেখানে গ্রন্থের নিবেদনে লেখকের এ ধরনের স্বীকারোক্তি লাভ করা যায়, যেখানে স্বাভাবিকভাবেই গ্রন্থটির গুণগত ও বিষয়বৈচিত্র্য সম্পর্কে পাঠকদের আগ্রহ বেড়ে যায়।

গ্রন্থটি সাতটি প্রবন্ধের সংকলন এবং তিনটি নির্দিষ্ট আঙ্গিকে বিন্যস্ত। প্রথম দুটি প্রবন্ধ যথাক্রমে 'মুর্শিদাবাদ জেলাঞ্চলে রেশম শিল্পের আদিপর্ব' এবং 'পুরানো মুর্শিদাবাদের এক সামুদ্রিক বণিক';

মুর্শিদাবাদ ঃ দুয়ার হতে দূরে। সৌমেন্দ্র কুমার গুপ্ত। চিকিতুষী প্রকাশনী, কলকাতা, ২০১৩, পৃষ্ঠা ১২৮, মূল্য : ১৬০ টাকা

পরবর্তী তিনটি প্রবন্ধ জীবনীমূলক, যেখানে মুর্শিদাবাদের সঙ্গে, বিশেষ করে বহরমপুর কৃষ্ণনাথ কলেজের সঙ্গে যুক্ত বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বদের জীবন সম্পর্কে ধারণা প্রদান করা হয়েছে, এবং শেষ দুটি প্রবন্ধ সাম্প্রতিক বিষয়কে কেন্দ্র করে রচনা, যেখানে জেলার অসম আঞ্চলিক বিকাশ ও বহরমপুর শহরের প্রধান সমস্যাবলীর বিষয় আলোচনা করা হয়েছে। সুতরাং বিষয় বৈচিত্র্যের নিরিখে গ্রন্থটি অনন্য। বিশেষ করে রচনা সংকলনটির শীর্ষক 'মুর্শিদাবাদ : দুয়ার হতে দূরে' সামগ্রিক অর্থবহ; কারণ মুর্শিদাবাদের আদি অবস্থান এবং বহির্বাণিজ্যে এর অবদান, যা প্রধানত রেশমকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছিল সে বিষয়ে যেমন সাবলীলভাবে আলোচনা করা হয়েছে, আবার সে অর্থে জেলার ভূমিপুত্র নন অথচ শিক্ষা ও রাজনৈতিক ভাবাদর্শে বহরমপুর কৃষ্ণনাথ কলেজের সঙ্গে সম্পৃক্ত ব্যক্তি, যাঁরা পরবর্তী সময়ে স্বমহিমায় নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করেছেন এবং জেলার নাম 'দুয়ার হতে দূরে' স্থাপন করেছেন।

রচনা সংকলনটির 'উদ্বোধিকা'-তে অধ্যাপক জহর সেন বিষয়টি সম্পর্কে সামগ্রিক ধারণা প্রদান করেছেন। প্রথম দুটি প্রবন্ধ প্রধানত দুটি কারণে তাৎপর্যপূর্ণ। প্রথমত, মুর্শিদাবাদ জেলার ইতিহাস যে কেবলমাত্র নবাবি আমলের রাজধানী শহর মুর্শিদাবাদের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়; কিংবা সেটা তার সূত্রপাত নয়, বরং এই জনপদের গৌরবজ্জ্বল ইতিহাস রয়েছে, তা অধ্যাপক গুপ্তের রচনায় অত্যন্ত সাবলীলভাবে প্রতিষ্ঠিত। দ্বিতীয়ত, মুর্শিদাবাদের রেশম শিল্পের খ্যাতি ছিল জগৎজোড়া। যার সুবাদে বহির্বিশ্বের সাথে মুর্শিদাবাদের সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল (পৃ.২৪)। প্রাচীন মুর্শিদাবাদ বিষয়ক আলোচনার ক্ষেত্র অনেকটাই সীমাবদ্ধ। কিন্তু অধ্যাপক কৌটিল্য বর্ণিত 'সুবর্ণকুড্য' যে বর্তমান মুর্শিদাবাদ জেলা তার স্পষ্ট নির্দেশ দিয়েছেন (পৃ.২৫)। মুর্শিদাবাদের বয়নশিল্পের ইতিহাস রচনা, যা জেলার আর্থিক ও বহির্বাণিজ্যের বিষয়কে নির্দেশ করে, অধ্যাপক গুপ্তের রচনা সামগ্রিক অলোচনাকে একটা আলাদা মাত্রা প্রদান করেছে।

'পুরানো মুর্শিদাবাদের এক সামুদ্রিক বণিক' রচনা-সংকলনের দ্বিতীয় প্রবন্ধ, যা রক্তমৃত্তিকার অধিবাসী এক নাবিক বুদ্ধগুপ্তের বিষয়ে তথ্য প্রদান করে। তবে, রক্তমৃত্তিকার প্রকৃত অবস্থান নিয়ে বিতর্ক রয়েছে। এ প্রসঙ্গে অধ্যাপক গুপ্ত যেমন নীহার রঞ্জন রায়ের অভিমতকে ব্যবহার করেছেন (পৃ.২৮-২৯), তেমনি পুরাতাত্ত্বিক অনুসন্ধানের উপরেও দৃষ্টি প্রদান করেছেন। ভারতের সঙ্গে, বিশেষ করে পূর্বভারতের এই অঞ্চলের সঙ্গে যে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলির বাণিজ্যিক সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছিল খ্রিস্টপূর্ব প্রথম শতক থেকেই সে বিষয়ে অধ্যাপক গুপ্ত নিশ্চিত (পৃ.২৯)। এক্ষেত্রে তিনি চীনা সাহিত্যিক উপাদানকে অনুসরণ করেছেন, তবে একপেশে উপাদান থেকে তথ্য সংগ্রহ না করে তিনি প্রথম ও দ্বিতীয় শতকের সংস্কৃত ও বৌদ্ধজাতক গ্রন্থ কিংবা টলেমির বিবরণ এবং পরবর্তী সময়ে বাংলার বাণিজ্যের ইতিহাস অনুসন্ধানের জন্য মঙ্গলকাব্যে বর্ণিত তথ্যসমূহ ব্যবহার করেছেন। আলোচ্য প্রবন্ধে বুদ্ধগুপ্তকে কেন্দ্র করে দূরদেশে বাণিজ্যিক সফলতা, নৌচালন প্রযুক্তির সার্থক ব্যবহার; এর পাশাপাশি বাণিজ্য প্রক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত বিভিন্ন শ্রমজীবী সম্প্রদায়ের ইতিহাস রচনার সার্বিক প্রয়াস করা হয়েছে (পৃ.৩৬)।

রচনা সংকলটির দ্বিতীয় অধ্যায়, অর্থাৎ জীবনীমূলক প্রবন্ধ সমূহে 'রবীন্দ্রনাথ-জগদীশ পত্রাবলির সুরেশচন্দ্র নাগ' শীর্ষক রচনাটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। কারণ এখান অধ্যাপক গুপ্ত দুই বিখ্যাত ব্যক্তিত্বের পত্রালাপে উঠে আসা একজন ব্যক্তি, যিনি সরাসরি এই মুর্শিদাবাদ জেলার ভূমিপুত্র নন, সেই সুরেশচন্দ্র নাগের বিষয়ে আলোচনা করেছেন। বিজ্ঞানের ছাত্র সুরেশচন্দ্র স্যার জগদীশচন্দ্র বসু-র সহকারী ছিলেন। কিন্তু প্রয়োগমূলক বিজ্ঞান শিক্ষার বিষয়ে তাঁর অধিক আগ্রহ ছিল, যে বিষয়ে ইঙ্গিত লাভ করা যায় রবীন্দ্রনাথকে লেখা জগদীশচন্দ্রের পত্রাবলির মধ্য দিয়ে (পৃ.৩৯)। এ প্রসঙ্গে অধ্যাপক গুপ্ত-র অভিমত, ''...আমরা এক 'সুরেশ'-এর কথা জানতে পারছি যিনি স্পষ্টতই ছিলেন যন্ত্রপাতি বা কারিগরি বিষয় সম্পর্কে অভিজ্ঞ এবং বিচারক্ষম দক্ষতার অধিকারী'' (পৃ.৪০)। সুরেশচন্দ্র যে জগদীশচন্দ্রের কত নিকট ও স্নেহভাজন ছিলেন তার প্রতিফলন স্বয়ং জগদীশচন্দ্রের উক্তি থেকেই লাভ করা যায়, যেখানে তিনি তাঁকে ''আমার শিষ্য সুরেশ'' বলেছেন (পৃ.৪০)। অধ্যাপক গুপ্ত প্রাসঙ্গিকভাবেই অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হয়েছেন, কে এই সুরেশ?— যিনি একদিকে প্রয়োগমূলক বিজ্ঞানচর্চার বিষয়ে আগ্রহী, আবার রবীন্দ্রনাথের আশ্রমের বিদ্যালয়ের ব্যাপারে যার সঙ্গে জগদীশচন্দ্র আলোচনা করতেন। এদেশীয় বিজ্ঞানচর্চ্চার ক্ষেত্রে সুরেশচন্দ্র নামের ভূমিকা স্বততই উজ্জ্বল। মুর্শিদাবাদ তথা বহরমপুর শহরের ভূমিপুত্র না হয়েও স্বকীয় কর্মপ্রতিভায় তিনি জেলার সম্পদে পরিণত হয়েছেন— এ যেন 'দূর হতে দুয়ারে'। বহরমপুর শহরে বিদ্যুৎ সরবরাহের লক্ষ্যে তিনি যে উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন তার দুটো দিক রয়েছে। প্রথমত, দেশীয় প্রচেষ্টায় বৈজ্ঞানিক বিকাশ এবং দ্বিতীয়ত, বাণিজ্যিকিকরণ, যা বাঙালির মধ্যে সেভাবে বিকাশলাভ করে নি এই পর্বে। যে সময় জাতীয় আন্দোলনের আবেগে সমগ্র দেশ উদ্বুদ্ধ, সে সময় সুরেশ নাগ একদিকে যেমন আন্দোলনকে সমর্থন করেছেন, তেমনি গঠনমূলক কাজের অঙ্গ হিসাবে বিজ্ঞানচর্চার ধারাকে এগিয়ে নিয়ে গিয়েছেন, তাকে প্রয়োগমুখী করে তোলার প্রয়াস করেছেন। এই প্রবন্ধটির বড় প্রাপ্তি কেবলমাত্র সুরেশচন্দ্র-ই নয়। তাঁর পারিবারিক অবস্থান সম্পর্কে একটি ধারণা অধ্যাপক গুপ্ত প্রদান করেছেন। নাগ পরিবার যদিও সরাসরিভাবে মুর্শিদাবাদের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন না, কিন্তু কৃষ্ণনাথ কলেজের সঙ্গে তাদের যে সম্পর্ক গড়ে উঠেছিলো তা এই পরিবারকে অনেকটাই এই জেলার কাছে নিয়ে আসে। শিক্ষা ও সংস্কৃতিতে পরিবারের প্রায়

সকল সদস্যই সমান কৃতিত্বের অধিকারী। এ প্রসঙ্গে অধ্যাপক গুপ্তের মতামত বিশেষ প্রণিধানযোগ্য, যেখানে তিনি লিখেছেন — ''বারদির নাগ ও তাঁদের আত্মীয় পরিবারের সাতাশজন ব্যক্তি, সুদূর ইংল্যান্ড ও আমেরিকায় উচ্চশিক্ষা লাভ করলেও একজনও ইন্ডিয়ান সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় উপস্থিত হন নি'' (পৃ.৪৪)। বিষয়টি যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ।

অধ্যাপক গুপ্তের রচনাশৈলীর প্রভাবে সমাজবিজ্ঞানী রাধাকমলের জীবন ও কর্মবৃত্তান্তও পাঠকদের কাছে আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছে। রাধাকমল সে অর্থে মুর্শিদাবাদের ভূমিপুত্র। কিন্তু তাঁর কর্মভূমি বরাবরই জেলা তথা বাংলার বাইরে, ফলে তাঁর সঙ্গে স্বদেশের ও স্বজনের একটা আপাতবিচ্ছিন্নতা তৈরি হয়েছে। এ বিষয়ে অধ্যাপক গুপ্ত লিখেছেন, ''রাধাকমল সম্পর্কে এই বিস্মৃতির একটি প্রধান কারণ হচ্ছে বাংলার জীবন সংস্কৃতি-প্রবাহের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগের বিচ্ছিন্নতা'' (পৃ.৪৯)। বাংলা থেকে বহু দূরে উত্তরপ্রদেশের লক্ষ্ণৌতে তিনি তাঁর শিক্ষা ও চেতনার আদর্শকে ছড়িয়ে দিতে সক্ষম হয়েছিলেন নিজেকে একজন আদর্শ শিক্ষক হিসাবে উপস্থাপনের মধ্য দিয়ে, তবে আক্ষেপের বিষয় যে সম্মান খ্যাতি রাধাকমল বাংলার বাইরে অর্জন করেছিলেন, তা তিনি বাংলায় অর্থাৎ বঙ্গভূমে লাভ করতে পারেন নি। এক্ষেত্রে জেলার ভূমিপুত্র হয়েও তিনি যেন 'দুয়ার হতে দূরে' অবস্থান করেছেন। তবে এ বিষয়ে রাধাকমলের আপাত সীমাবদ্ধতার দিকে অধ্যাপক গুপ্ত দৃষ্টি প্রদান করে লিখেছেন যে, ''...জ্ঞানচর্চার ক্ষেত্রে রাধাকমলের অবদান মূলত ইংরাজি ভাষায় সীমাবদ্ধ ছিল'' (পৃ.৪৯)। তাঁর জ্ঞানচর্চা অর্থনীতির সীমা অতিক্রম করে রাষ্ট্রবিজ্ঞান, দর্শন, সমাজতত্ত্ব ও নৃতত্ত্বের অর্থাৎ বৃহত্তর সমাজবিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় বিস্তার লাভ করে। রাধাকমল ও তাঁর চিন্তাধারা কীভাবে সাম্প্রতিককালেও প্রাসঙ্গিক, প্রবন্ধটির মধ্য দিয়ে অধ্যাপক গুপ্ত সে বিষয়ও অনুসন্ধানের প্রয়াস করেছেন (পৃ.৫০)। বিশেষ করে পরিবেশবিদ্যার উপর রাধাকমলের যে বিশেষ আগ্রহ ছিল, সে বিষয়ে এই লেখা থেকে তথ্য লাভ করা যায় (পৃ.৫০)।

প্রবন্ধটির মধ্য দিয়ে লেখক একদিকে যেমন রাধাকমলের কর্মজীবনের বৈচিত্র্যপূর্ণ দিককে অনুসন্ধানের প্রয়াস করেছেন, পাশাপাশি কীভাবে মুখোপাধ্যায় পরিবার জেলার শিক্ষা ও জ্ঞানবিজ্ঞান প্রসারে বিশেষ ভূমিকা পালন করেছিল সে বিষয়েও পরিষ্কার ধারণা রয়েছে প্রবন্ধটিতে। রাধাকমলের শিক্ষাজীবন শুরু হয়েছিল বহরমপুর কলেজিয়েট স্কুল থেকে, পরে কৃষ্ণনাথ কলেজ, যেখানে তিনি স্বদেশী চিন্তাধারা ও আন্দোলনের বিষয়ে গভীরভাবে আগ্রহী হয়ে ওঠেন। জীবনের এই গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্তের কিছু মানবিক আবার কিছু বৌদ্ধিক চিন্তাচেতনার পরিবর্তনের এক সার্বিক চিত্র অধ্যাপক গুপ্তের 'রাধাকমল' সম্পর্কিত রচনার মধ্য দিয়ে লাভ করা যায়, যদিও বিষয়টি অনেকটাই তথ্যনিষ্ঠ আলোচনা, বিশ্লেষণের ভূমিকা খুবই কম, তবুও এই সংক্ষিপ্ত আলোচনা বিষয় সম্পর্কে সামগ্রিক ধারণা উপস্থাপনে সক্ষম— এ যেন 'বিন্দুর মধ্যে সিন্ধু প্রাপ্তি'।

রাধাকমলের কর্মজীবনেও মুর্শিদাবাদ জেলা তথা বহরমপুর কৃষ্ণনাথ কলেজের ভূমিকা বিষয়ে ধারণা লাভ করা যায় অধ্যাপক গুপ্তের রচনায়। রাধাকমল কেবলমাত্র প্রতিষ্ঠিত অধ্যাপক এবং সুগবেষক-ই ছিলেন না, দেশ-সমাজ-জাতির প্রতি তাঁর দায়িত্ব সম্পর্কে তিনি সমান সচেতন ছিলেন, শ্রমজীবী নৈশ বিদ্যালয় স্থাপন, বহরমপুর শহরের পার্শ্ববর্তী গ্রামে সমবায় গঠন কিংবা বিপ্লবী আন্দোলনের সঙ্গে সম্পর্ক রক্ষা করা চলা প্রভৃতি প্রতিটি পদক্ষেপ তাঁর জীবন ও আদর্শ সম্পর্কে সম্যক ধারণা প্রদান করে এবং এ বিষয়টি অধ্যাপক গুপ্তের রচনাশৈলীতে মূর্ত হয়ে উঠেছে। সমবায়ের মধ্য দিয়ে বাংলার গ্রামীণ জীবনের সঙ্গে সরাসরি পরিচিত হওয়ার সুযোগ পেয়েছিলেন রাধাকমল, ফলে তাঁর অর্থনৈতিক চিন্তার ক্ষেত্রেও এর প্রভাব ও প্রতিফলন লক্ষ্য করা যায়। রাধাকমলের প্রথম দুটি বাংলা বই এবং পিএইচডি-র নিবন্ধের মধ্যেও এ বিষয়ের প্রভাব রয়েছে (পৃ.৫৭)। রাধাকমলের অর্থনৈতিক ও সমাজতাত্ত্বিক চিন্তাচেতনার বিষয়ে অনুসন্ধানে প্রয়াসী হয়েছেন অধ্যাপক গুপ্ত (পৃ.৬১)। কীভাবে সাধারণের সঙ্গে শিক্ষার প্রসার হেতু রাধাকমলের যোগাযোগ গড়ে উঠেছিল সে বিষয়টি প্রবন্ধে পরিষ্কারভাবে ফুটে উঠেছে। প্রবন্ধটির অপর একটি আগ্রহের জায়গা রবীন্দ্র সমালোচনা ও তার নিরিখে রাধাকমলের কাজের মূল্যায়ন (পৃ.৬২-৬৬) আবার সমান্তরালভাবে রাধাকমলের সমাজতাত্ত্বিক আলোচনা ভারতীয় সমাজ পরিকাঠামোর বিবাহ, পরিবার, জাতি ও শ্রেণী ভিত্তিক সামাজিক স্তর বিন্যাস, গ্রামীণ নাগরিক বসতি বিন্যাস প্রভৃতি বিষয়ে সামগ্রিক তথ্য প্রদানে সক্ষম। অধ্যাপক গুপ্ত রাধাকমলকে 'দিকপাল সমাজবিজ্ঞানী' বলে অভিহিত করেছেন এবং এই বক্তব্যের সপক্ষে তিনি রাধাকমলের বিরাট বিষয়বৈচিত্র্য সম্পন্ন রচনাসম্ভারের দীর্ঘ তালিকা প্রস্তুত করেছেন (পৃ.৭৭), যা সাধারণ আগ্রহী পাঠক ও গবেষক মহলকে বিষয় সম্পর্কে ভাবতে সাহায্য করবে। রাধাকমলের ভাবনাকে কয়েকটি পর্যায়ে বিন্যস্ত করে তার সার্বিক মূল্যায়ন অধ্যাপক গুপ্তের রচনায় লাভ করা যায় (পৃ. ৭৮-৮২); যেখানে তিনি প্রাথমিক পর্বে তাঁর সমাজ ও অর্থনৈতিক চিন্তা, মধ্যবর্তী পর্বে সমাজ-বিজ্ঞানের প্রতি আগ্রহ এবং মার্কসীয় অর্থনীতির প্রয়োগ, ও শেষত সামাজিক সমস্যাবলির প্রসঙ্গে অর্থনৈতিক বৈষম্য ও সামাজিক অসাম্যের বিষয় আলোচনা। সমগ্র প্রবন্ধে একাধিক তথ্যসূত্র লেখক ব্যবহার করেছেন, তবে তার সিংহভাগই Secondary Sources ।

মাস্টারদা সূর্য সেন সম্পর্কিত রচনাটি আবর্তিত হয়েছে বহরমপুর কৃষ্ণনাথ কলেজে তাঁর কার্যাবলি প্রসঙ্গে। মাস্টারদা সরাসরিভাবে মুর্শিদাবাদ শহরের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন না, কিন্তু

কৃষ্ণনাথ কলেজে পড়তে আসার সময় এই জেলা ও তার মানুষের সঙ্গে অনেকটা একাত্ম হয়ে পড়েছিলেন তিনি। এই প্রবন্ধটিতে অধ্যাপক গুপ্ত কিছু মৌলিক প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন (পৃ.৮৬), যেগুলি মাস্টারদার রাজনৈতিক জীবন ও কৃষ্ণনাথ কলেজকে কেন্দ্র করে আবর্তিত। সূর্য সেন বিষয়ক প্রবন্ধটিও দুটি ভাগে বিন্যস্ত : ক) কৃষ্ণনাথ কলেজের বিপ্লবী ঐতিহ্য এবং মাস্টারদা : একটি খসড়া; খ) বহরমপুরে মাস্টারদা : কিছু জিজ্ঞাসা, কিছু অনুমান। এই দুটি বিভাজন থেকে বিষয় সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা লাভ করা সম্ভব।

প্রথম অংশে অধ্যাপক গুপ্ত কৃষ্ণনাথ কলেজ এবং তার সঙ্গে বৈপ্লবিক আন্দোলনের ধারা কীভাবে যুক্ত ছিল, সে বিষয়ে অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হয়েছেন (পৃ.৮৮)। এ প্রসঙ্গে লক্ষণীয়, আত্মোন্নতি সমিতি, বিবেকানন্দ সোসাইটি, ডন সোসাইটি, সুহৃদ সমিতি ও ছাত্রভাণ্ডার প্রভৃতি বৈপ্লবিক সংগঠনগুলির সঙ্গে মুর্শিদাবাদ জেলার, বিশেষ করে কৃষ্ণনাথ কলেজের ছাত্ররা কীভাবে যুক্ত হয়েছিল, তা অনুসন্ধানের প্রয়াস করেছেন গ্রন্থকার। পাঠকদের কাছে সবচেয়ে বড় প্রাপ্তি কেবলমাত্র সূর্য সেন প্রসঙ্গেই আলোচনায় সীমাবদ্ধ থাকে নি, অনেকক্ষেত্রেই সমকালীন বাংলার রাজনৈতিক পরিস্থিতির বিষয়েও লেখক অবতারণা করেছেন। অধ্যাপক গুপ্ত বহরমপুরে মাস্টারদাকে নিয়ে কিছু নির্দিষ্ট আঙ্গিকে প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন— যেগুলি বিষয় সম্পর্কে সাধারণ পাঠককে আকৃষ্ট করে এবং গবেষকদের গভীরতম গবেষণার বিষয়ে উৎসাহিত করে (পৃ. ৯৯)। মাস্টারদা সম্পর্কে অনুসন্ধান প্রসঙ্গে তিনি বেশ কিছু সহায়ক গ্রন্থের তথ্য ব্যবহার করেছেন, যা পরবর্তী সময়ে বিষয় সম্পর্কে জানার ক্ষেত্রকে প্রসারিত করে। মাস্টারদা যে দু বছর কৃষ্ণনাথ কলেজের ছাত্র ছিলেন, সেসময় জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ঘটনাবলী কীভাবে তাঁকে প্রভাবিত করেছিল— সে বিষয়েও অধ্যাপক গুপ্তের রচনায় ইঙ্গিত লাভ করা যায়। তবে চরমপন্থী আন্দোলন সম্পর্কিত ইতিহাস রচনার সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে অধ্যাপক গুপ্ত সচেতন, কারণ তিনি বলেছেন, ''গোপন বিপ্লবী আন্দোলনের যে কোনও দিকেরই ইতিহাস রচনার চেষ্টা কষ্টসাধ্য হয়ে ওঠে আন্দোলনের গোপন চরিত্রের জন্যই'' (পৃ. ১১০)। এই বক্তব্যটি খুব প্রাসঙ্গিক দৃষ্টিকোণ থেকে বলা হয়েছে। বর্তমানে ইতিহাসচর্চার ধারায় যে 'পোস্ট মডার্ন' দৃষ্টিভঙ্গির প্রবেশ ঘটেছে সেদিক থেকে অধ্যাপক গুপ্ত বিপ্লবীদের স্মৃতিকথা, পুলিশ রিপোর্ট, সরাসরি দলিল, এমন কি সংবাদপত্রের প্রকাশিত খবরকেও বিশেষভাবে অনুসন্ধানের প্রয়োজনীয়তার কথা বলেছেন (পৃ১১০)।

সাম্প্রতিক বিষয় সমানভাবে এই সংকলনে স্থান লাভ করেছে। 'মুর্শিদাবাদ জেলার অসম আঞ্চলিক বিকাশ' ও 'শহর বহরমপুরের প্রধান সমস্যাবলি' জেলার বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে ধারণা প্রদান করে। আঞ্চলিক বিকাশ সম্পর্কে অধ্যাপক গুপ্তের একটা নিজস্ব দৃষ্টিকোণ রয়েছে। উন্নয়ন সম্পর্কিত তাঁর বক্তব্য অমর্ত্য সেন কিংবা প্রণব বর্ধনের মতো খ্যাতিসম্পন্ন অর্থনীতিবিদদের থেকে কিছুটা ভিন্নধর্মী। কারণ অধ্যাপক গুপ্তের প্রদত্ত পরিসংখ্যান ১৯৯১ থেকে ২০০১ সাল পর্যন্ত কেবলমাত্র মুর্শিদাবাদ জেলার পাঁচটি মহকুমাকে কেন্দ্র করে নির্মাণ করা হয়েছে। তিনি উন্নয়ন ও দারিদ্রের যে পরিসংখ্যান প্রদান করেছেন তাকে সার্বিক বলে গণ্য করা যেতে পারে না। তবে রাঢ় ও বাগড়ি অঞ্চলের উন্নয়ন সংক্রান্ত বিষয়টিও যথেষ্ট আকর্ষক।

বহরমপুর শহরের প্রধান সমস্যাবলিকে তিনটি ভাগে অধ্যাপক গুপ্ত ভাগ করেছেন (পৃ. ১২৩), যা থেকে তাঁকে সমাজ ও সময় সচেতন গবেষক বলে মনে হয়। তাছাড়া সমাজ বিজ্ঞানের ছাত্র হিসাবে তিনি জনবসতি অঙ্গন বা 'পাড়া'গুলিকে সামাজিক গোষ্ঠী, পেশা, স্থানীয় বৈশিষ্ট্য এবং ব্যক্তির নামে বিভক্ত করে বিষয়ভিত্তিক অনুসন্ধান করেছেন (পৃ. ১২৫-২৬)। বহরমপুর শহরের অনুন্নয়ন বিষয়ে লেখকের নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি ও পরিসংখ্যান রয়েছে। ২০০১-২০০৪ সাল পর্যন্ত প্রাপ্ত পৌর তথ্যসমূহ লেখক ব্যবহার করেছেন, তবে এক্ষেত্রে এনজিও সমূহের গৃহীত তথ্যসমূহ ব্যবহারের অবকাশ রয়েছে।

অধ্যাপক গুপ্তের এই রচনা-সংকলন নিশ্চিতভাবে আঞ্চলিক ইতিহাসচর্চার ধারাকে গভীরভাবে সমৃদ্ধ করবে, উৎসাহিত করবে গবেষক মহলকেও। কিন্তু বিষয় সম্পর্কে প্রাথমিক তথ্য-নির্ভর জ্ঞান ও তার সামগ্রিক বিশ্লেষণের প্রয়োজন রয়েছে, যা সেভাবে এই গ্রন্থটিতে লাভ করা যায় না। তবে সচেতন গবেষক এই গ্রন্থটিকে বিষয় সম্পর্কে একটি প্রাথমিক ধারণা আরোহনের ক্ষেত্র হিসাবে স্থির করে পরবর্তীতে অধিকসংখ্যক প্রাথমিক তথ্যসূত্র নির্ভর গবেষণায় ব্যাপৃত হবেন। গ্রন্থটিতে ক্রমন্বয়তার অভাবও লক্ষণীয়, কারণ যদিও নবাবি মুর্শিদাবাদ অধিক আলোচিত বিষয়, উন্নয়ন প্রসঙ্গে সে সময়কালকে লেখক গ্রহণ করেন নি। আবার তথ্যসূচি ব্যবহারের ক্ষেত্রেও কিছু সীমাবদ্ধতা রয়েছে, কারণ সেগুলি ভবিষ্যৎ গবেষকদের এবিষয়ে সঠিক দিশা প্রদান করবে সীমিত অর্থে।

আপাত কিছু সীমাবদ্ধতা থাকলেও অধ্যাপক গুপ্তের 'মুর্শিদাবাদ ঃ দূয়ার হতে দূরে' বিস্মৃতির আড়ালে থাকা প্রান্তিক জেলা মুর্শিদাবাদের অতীত থেকে বর্তমানের ইতিহাস-অর্থনীতি তুলে এনেছেন। শহর মুর্শিদাবাদ নয়, জেলা মুর্শিদাবাদ স্থান পেয়েছে, উন্নয়নের বিষয় আলোচিত হয়েছে— তা আগামী প্রজন্মকে এবিষয়ে ভাবতে সাহায্য করবে। যদিও অনেক ক্ষেত্রে আলোচনায় বহরমপুর-কেন্দ্রিকতা লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু তবুও জেলার একপেশে রাজনৈতিক ইতিহাস চর্চার ধারাবাহিকতার বাইরে বিষয়বৈচিত্র্যে পরিপূর্ণ এই রচনা সংকলন আগামী দিনে আঞ্চলিক ইতিহাসচর্চার ধারাকে নূতন পথের সন্ধান দেবে।